সত্যবার্তা

বর্ষ ১৪ সংখ্যা ৭
নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০২২

ইউনিফর্ম সিভিল কোড

কিসের ইঙ্গিত ?

বাস্তবায়নের জোর প্রস্তুতি

"হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য কথা বলো।"

– আল কুরআন (৩৩:৭০)

"জালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা উত্তম জিহাদ।"

– নাসাঈ:৪২২০

সত্যবাক

বর্ষ- ১৪, সংখ্যা - ৭

নভেম্বর - ডিসেম্বর, ২০২২

পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৪

মুখ্য সম্পাদক - আলমগীর হোসেন

সম্পাদক - সাউদ হাসান

8250712281

সার্কুলেশন ম্যানেজার - আরজাউল সেখ

9635779370

এডিটোরিয়াল বোর্ড

রফিকুল ইসলাম

আব্দুল্লাহ মিসবাহি

মাহমুদ হাসান

আব্দুর রহমান

ওয়াসিম রেজা

মূল্য ১০/-

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ১

তাদের দ্বীনে না ফেরানো পর্যন্ত তারা নিবৃত্ত হবে না!

কুরআনের পয়গাম ২

মু'মিনরা সফল হয়েছে

হাদিসের পয়গাম ৪

এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের হক্ব

প্রবন্ধ ৬

ইসলামের সোনালী পরশে ধন্য হয়েছিলেন যারা!

তাওবাহ : গুরুত্ব ও পদ্ধতি

'বেষ্ট অফ ক্রিয়েচারস' হতে চান না?

বিশেষ প্রবন্ধ ১১

মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের কারণ ও উত্তরণের উপায়

সমকালীন প্রসঙ্গ ১৫

নববর্ষ

বিজ্ঞানের পাতা ১৭

প্রমাণ এবং বিশ্বাসের মধ্যেকার পার্থক্য

পিঁপড়ে কি কথা বলতে পারে?

ইতিহাসের পাতা ১৯

অখন্ড ভারতঃ অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান!

বোনেদের পাতা ২২

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নারীদের অবদান

কবিতা - কানন ২৪

স্বত্বঃ ইসলামিক ইয়ুথ ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে মোহাঃ জইদুর রহমান কর্তৃক ৩বি ক্রিসেন্ট এপার্টমেন্ট ৩য় তল, হাতিয়াড়া, কোলকাতা ৭০০১৫৭ থেকে প্রকাশিত।

e-mail: satyabaakwb@gmail.com, web: https://satyabaak.iyfindia.org

সম্পাদকীয়

তাদের দ্বীনে না ফেরানো পর্যন্ত তারা নিবৃত্ত হবে না!

হক্ব ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। সূচনা লগ্ন থেকেই হক্ব ও বাতিল, তাওহীদ ও শিরক ঈমান ও কুফরের দ্বন্দ্ব চলে আসছে। বাতিল সর্বদা চায় হক্বকে দমিয়ে রাখতে, কিন্তু বাতিল শক্তি যখন মসনদে অধিষ্ঠিত থাকে তখন হক্ব এবং হক্বের অনুসারীদের পুরোপুরি মিটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। কিন্তু কস্মিনকালেও হক্বকে পুরোপুরি মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। মহান পাক রাব্বুল আলামিন বলেন- يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ "তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতাদানকারী। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে" (সূরা আস-স্বফ-৮)। তথাপি বাতিল শক্তি সর্বদা তাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় রত থাকে। আল্লাহর জমিনে যেখানেই বাতিল শক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে সেখান থেকে হক্বকে পুরোপুরি বিলীন করে দেওয়ার জন্য তারা তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করে এক. হকের অনুসারীদের ওই ভূমি থেকে বিতাড়িত করা। দুই. তাদের দ্বীন অর্থাৎ মতবাদ মানতে বাধ্য করা। তিন. তাদের মতবাদ ও বিধান না মানলে হত্যা করা। সূরা ইব্রাহীমের ১৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا "কাফিরেরা তাদের রাসূলদেরকে বলেছিলঃ আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দেশ হতে বহিস্কার করবো, অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতেই হবে"। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন- "যদি তারা সক্ষম হয় তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন হতে ফিরাতে না পারা পর্যন্ত নিবৃত্ত হবেনা" (সূরা বাকারা- ২১৭) হক্বের অনুসারীদের দ্বীন থেকে ফেরানোর জন্য কুফরি শক্তি সর্বাত্মক চেষ্টা করে এবং ফেরাতে না পারলে শেষ পর্যন্ত হত্যা করে।

ভারতবর্ষে আজ বাতিল তথা কুফুরি শক্তি ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত এবং তারা হক্বের বিরুদ্ধে কূট-কৌশলে রত। মুসলিমদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য **NRC** করার পরিকল্পনা করেছে, কিন্তু **NRC** করার পরেও সমস্ত মুসলিমকে বিতাড়িত করা যাবে না, কারণ অনেক মুসলিম দূর-দূরান্ত পাড়ি দিয়ে কাগজপত্র ঠিক করে নিয়ে সময় মত কাগজপত্র দেখিয়ে দেবে, ফলস্বরূপ সেই সমস্ত মুসলিমরা কিন্তু ভারতবর্ষে থাকার সুযোগ পেয়ে যাবে। তাই তারা দ্বিতীয় কৌশল হিসেবে সংবিধানের ৪৪ নম্বর ধারাকে ঢালরূপে ব্যবহার করে **Uniform Civil Code** নিয়ে আসার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গত ৯ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় **Uniform Civil Code** নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং পক্ষে-বিপক্ষে মৌখিক মতামত নেওয়া হয়েছে। যেখানে পক্ষে ৬৩ টি ভোট এবং বিপক্ষে ২৩ টি ভোট পড়েছে। যদিও **UCC** বা অভিন্ন দেওয়ানি আইন ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক তথাপি ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপালের দোহাই দিয়ে ক্ষমতার জোরে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সরকার কিন্তু এটাকে লাগু করবেই। আর মোহন ভাগবতসহ অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী নেতাদের বক্তব্য ও বিবৃতি থেকে এটা জলের মতো পরিষ্কার যে, **Uniform Civil Code** এর মাধ্যমে তারা কী চালু করতে যাচ্ছে। **UCC** লাগু হলে শুধু যে 'মুসলিম পার্সোনাল ল' কে ধ্বংস করা হবে তা নয় বরং এর সাথে সাথে ব্যক্তিগতক্ষেত্রে ইসলাম পালনে বাঁধা দেওয়া হবে এবং এমন কিছু মানতে বাধ্য করা হবে যা নিমেষেই ঈমানকে হরণ করে নেবে। এমনকি বাধ্য করার পরেও যে সমস্ত মুসলিমরা তাদের বিধি-বিধান মানবে না তাদেরকে হত্যা পর্যন্ত করবে। ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এটাই পরিলক্ষিত হয় যে, যেখানেই বাতিল শক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেছে সেখানে তারা হক্বকে সমূলে উচ্ছেদের জন্য এইরূপ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে।

ভারতবর্ষে উদ্ভূত এই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে নবী-রাসুলদের মতই পন্থা অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ ঈমান ও দ্বীনের ব্যাপারে হতে হবে আপোষহীন। ঈমান এবং দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য হিজরত করার সুযোগ থাকলে হিজরত করতে হবে, নতুবা ঈমান ও দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করে যেতে হবে। দ্বীনকে রক্ষার নিমিত্তে লড়াই করতে করতে মৃত্যুবরণ করলে আমরা শহীদ হিসেবে পরিগণিত হবো। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ, যে ব্যক্তি নিজের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ, যে ব্যক্তি দ্বীন রক্ষার্থে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ এবং নিজের পরিবারে প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ।" (আবু দাউদ - ৪৭৭২), সর্বপরি আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে এবং এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, জালিমরা যেগুলো করছে সেই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা উদাসীন নন, তাদের কৃতকর্মের জন্য অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করবেন এবং আল্লাহ তাআলা অবশ্যই মুমিনদেরকে সাহায্য করবেন কারণ মু'মিনদের সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে দ্বীনের উপর অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন, আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

মু'মিনরা সফল হয়েছে

আহমাদ মুসা

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

১) অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে।
২) যারা নিজেদের নামাযে বিনয় নম্রতা অবলম্বন করে।
৩) যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে।

ব্যাখ্যা:-

(১) অবশ্যই বিশ্বাসীগণ সফলকাম হয়েছে

فَلَاح শব্দের আভিধানিক অর্থ হল চিরা, বিদীর্ণ করা, কাটা। চাষীকে فَلَّاح বলা হয়, যেহেতু সেও মাটি চিরে ওর মধ্যে বীজ বপন করে থাকে। مُفْلِح (সফলকাম)ও সে হয়, যে অনেক কষ্ট ও সংকটের বুক চিরে নিজ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। অথবা তার জন্য সাফল্যের পথ খুলে যায়; তার জন্য সে পথ বন্ধ হয় না। শরীয়তের দৃষ্টিতে সফলকাম সেই ব্যক্তি, যে ধূলির ধরায় বাস করে নিজ প্রভুকে সন্তুষ্ট করে নেয় এবং তার বিনিময়ে আখেরাতে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার অধিকারী বিবেচিত হয়। আর সেই সাথে যদি পার্থিব সুখ-শান্তি লাভ হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। তবে সত্যিকার সফলতা পরকালের সফলতা; যদিও দুনিয়ার মানুষ এর বিপরীত দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও সুখ-সম্পদকে আসল সফলতা মনে করে। আয়াতে সেইসব মুমিনদেরকে সফলতার সুসংবাদ শোনানো হয়েছে, যাঁদের মধ্যে উক্ত গুণাবলী বিদ্যমান আছে।

২. যারা তাদের স্বলাতে ভীতি-অবনত

এ হচ্ছে সফলতা লাভে আগ্রহী মুমিনের প্রথম গুণ। "খুশূ" এর আসল মানে হচ্ছে, স্থিরতা, অন্তরে স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ ঝুঁকে পড়া, দমিত বা বশীভূত হওয়া, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। [আদওয়াউল বায়ান] ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ, ভীত ও শান্ত থাকা। [ইবন কাসীর] মুজাহিদ বলেনঃ দৃষ্টি অবনত রাখা। শব্দ নিচু রাখা। "খুশূ এবং খুদ্বু" দুটি পরিভাষা। অর্থ কাছাকাছি। তবে খুদ্বু কেবল শরীরের উপর প্রকাশ পায়। আর খুশূ মন, শরীর, চোখ ও শব্দের মধ্যে প্রকাশ পায়। আল্লাহ বলেন, "আর রহমানের জন্য যাবতীয় শব্দ বিনীত হয়ে গেছে।" [সূরা ত্বা-হা: ১০৮] আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, খুশূ হচ্ছে, ডানে বা বামে না তাকানো। [বাগভী] অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, খুশূ হচ্ছে মনের বিনয়। [ইবন কাসীর] সায়ীদ ইবন জুবাইর বলেন, খুশূ হচ্ছে, তার ডানে ও বামে কে আছে সেটা না জানা। আতা বলেনঃ দেহের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা। [বাগভী]

উপরের বর্ণনাগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, খুশূর সম্পর্ক মনের সাথে এবং দেহের বাহ্যিক অবস্থার সাথেও। মনের খুশূ হচ্ছে মানুষ কারোর ভীতি, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রতাপ ও পরাক্রমের দরুন সন্ত্রস্ত ও আড়ষ্ট থাকবে। আর দেহের খুশূ হচ্ছে, যখন সে তার সামনে যাবে তখন মাথা নত হয়ে যাবে, অংগ-প্রত্যঙ্গ ঢিলে হয়ে যাবে, দৃষ্টি নত হবে, কণ্ঠস্বর নিম্নগামী হবে এবং কোন জবরদস্ত প্রতাপশালী ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হলে মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভীতির সঞ্চার হয় তার যাবতীয় চিহ্ন তার মধ্যে ফুটে উঠবে। স্বলাতে খুশূ বলতে মন ও শরীরের এ অবস্থাটি বুঝায় এবং এটাই স্বলাতের আসল প্রাণ।

যদিও খুশূর সম্পর্ক মূলত মনের সাথে এবং মনের খুশূ আপনা আপনি দেহে সঞ্চারিত হয়, তবুও শরীয়তে স্বলাতের এমন কিছু নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে যা একদিকে মনের খুশূ (আন্তরিক বিনয়-নম্রতা) সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে খুশূর হ্রাস-বৃদ্ধির অবস্থায় স্বলাতের কর্মকাণ্ডকে কমপক্ষে বাহ্যিক দিক দিয়ে একটি বিশেষ মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত রাখে। এই নিয়মগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, স্বলাত আদায়কারী যেন ডানে বামে না ফিরে এবং মাথা উঠিয়ে উপরের দিকে না তাকায়, স্বলাতের মধ্যে বিভিন্ন দিকে ঝুঁকে পড়া নিষিদ্ধ। বারবার কাপড় গুটানো অথবা ঝাড়া কিংবা কাপড় নিয়ে খেলা করা জায়েয নয়। সিজদায় যাওয়ার সময় বসার জায়গা বা সিজদা করার জায়গা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। তাড়াহুড়া করে টপাটপ স্বলাত আদায় করে নেয়াও ভীষণ অপছন্দনীয়। নির্দেশ হচ্ছে, স্বলাতের প্রত্যেকটি কাজ পুরোপুরি রুকূ, সিজদা, দাঁড়ানো বা বসা যতক্ষণ পুরোপুরি শেষ না হয় ততক্ষণ অন্য কাজ শুরু করা যাবে না। স্বলাত আদায় করা অবস্থায় যদি কোন জিনিস কষ্ট দিতে থাকে তাহলে এক হাত দিয়ে তা দূর করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু বারবার হাত নাড়া অথবা বিনা প্রয়োজনে উভয় হাত একসাথে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

এ বাহ্যিক আদবের সাথে সাথে স্বলাতের মধ্যে জেনে

বুঝে স্বলাতের সাথে অসংশ্লিষ্ট ও অবান্তর কথা চিন্তা করা থেকে দূরে থাকার বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনিচ্ছাকৃত চিন্তা-ভাবনা মনের মধ্যে আসা ও আসতে থাকা মানুষ মাত্রেরই একটি স্বভাবগত দুর্বলতা। কিন্তু মানুষের পুর্ণপ্রচেষ্টা থাকতে হবে স্বলাতের সময় তার মন যেন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং মনে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্য চিন্তাভাবনা এসে যায় তাহলে যখনই মানুষের মধ্যে এর অনুভূতি সজাগ হবে তখনই তার মনোযোগ সেদিক থেকে সরিয়ে নিয়ে পুনরায় স্বলাতের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ খুশূ হচ্ছে, অন্তরে বাড়তি চিন্তা-ভাবনা ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা; অনর্থক নড়াচড়া না করা। বিশেষতঃ এমন নড়াচড়া, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বলাতে নিষিদ্ধ করেছেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ স্বলাতের সময় আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ না সে অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না দেয়। তারপর যখন সে অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। [ইবনে মাজাহঃ ১০২৩]

(৩) যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে

পূর্ণ মুমিনের এটি দ্বিতীয় গুণঃ অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা। لغو এর অর্থ অসার ও অনর্থক কথা বা কাজ। এর মানে এমন প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন ও যাতে কোন ফল লাভও হয় না। শির্কও এর অন্তর্ভুক্ত, গোনাহের কাজও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে [ইবন কাসীর] অনুরূপভাবে গান-বাজনাও এর আওতায় পড়ে। [কুরতুবী]

মোটকথা: যেসব কথায় বা কাজে কোন লাভ হয় না, যেগুলোর পরিণাম কল্যাণকর নয়, যেগুলোর আসলে কোন প্রয়োজন নেই, যেগুলোর উদ্দেশ্যও ভালো নয় সেগুলো সবই 'বাজে' কাজের অন্তর্ভুক্ত। যাতে কোন দ্বীনী উপকার নেই বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। রাসূলুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে।" [তিরমিযীঃ ২৩১৭, ২৩১৮, ইবনে মাজাহঃ ৩৯৭৬]

এ কারণেই আয়াতে একে কামেল মুমিনদের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আয়াতের পূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, তারা বাজে কথায় কান দেয় না এবং বাজে কাজের দিকে দৃষ্টি ফেরায় না। সে ব্যাপারে কোন প্রকার কৌতুহল প্রকাশ করে না। যেখানে এ ধরনের কথাবার্তা হতে থাকে অথবা এ ধরনের কাজ চলতে থাকে। সেখানে যাওয়া থেকে দূরে থাকে। তাতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত হয় আর যদি কোথাও তার সাথে মুখোমুখি হয়ে যায় তাহলে তাকে উপেক্ষা করে, এড়িয়ে চলে যায় অথবা অন্ততঃপক্ষে তা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যায়। একথাটিকেই অন্য জায়গায় এভাবে বলা হয়েছেঃ "যখন এমন কোন জায়গা দিয়ে তারা চলে যেখানে বাজে কথা হতে থাকে অথবা বাজে কাজের মহড়া চলে তখন তারা ভদ্রভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে চলে যায়।" [সূরা আল ফুরকানঃ ৭২]

এ ছাড়াও মুমিন হয় একজন শান্ত-সমাহিত ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির অধিকারী এবং পবিত্র-পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন মানুষ। বেহুদাপনা তার মেজাজের সাথে কোন রকমেই খাপ খায় না। সে ফলদায়ক কথা বলতে পারে, কিন্তু আজেবাজে গল্প-গুজব তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সে ব্যাঙ্গ, কৌতুক ও হালকা পরিহাস পর্যন্ত করতে পারে। কিন্তু উচ্ছল ঠাট্টা-তামাসায় মেতে উঠতে পারে না, বাজে ঠাট্টা-মস্করা বরদাশত করতে পারে না এবং আনন্দ-ফুর্তির কথাবার্তাকে নিজের পেশায় পরিণত করতে পারে না।

তার জন্য তো এমন ধরনের সমাজ হয় একটি স্থায়ী নির্যাতন কক্ষ বিশেষ, যেখানে কারো কান কখনো গালি-গালাজ, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপবাদ, মিথ্যা কথা, কুরুচিপুর্ণ গান-বাজনা ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে নিরাপদ থাকে না। আল্লাহ তাকে যে জান্নাতের আশা দিয়ে থাকেন তার একটি অন্যতম নিয়ামত তিনি এটাই বর্ণনা করেছেন যে, "সেখানে তুমি কোন বাজে কথা শুনবে না।" [সূরা মারইয়ামঃ ৬২, সূরা আল-ওয়াকি'আহঃ ২৫, সূরা আন-নাবাঃ ৩৫, অনুরূপ সূরা আত-তূরের ২৩ নং আয়াত]

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

১) সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অফিস।

২) সত্যবাক এডিটরের
Whatsapp No. (8250712281)

৩) সত্যবাকের ই-মেইল -
satyabaakwb@gmail.com

এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের হক্ব

আব্দুল্লাহ্ মিসবাহী

عن أبي هريرة- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ، قِيْلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সাঃ) বলেছেন, একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রসূল! সেগুলো কি কি? বললেন, সাক্ষাতে সালাম বিনিময় করা, দাওয়াত করলে গ্রহণ করা, উপদেশ চাইলে উপদেশ দেওয়া, হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা, অসুস্থ হলে সাক্ষাৎ করে খোঁজ খবর নেয়া এবং মৃত্যুবরণ করলে কাফন দাফনে অংশ গ্রহন করা। [মুসলিম – ৪০২৩]

হাদীসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ-

উক্ত হাদিসের রাবী (বর্ণনাকারী) হলেন বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। উক্ত হাদীসে ছয়টি হক্ব সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।

হক্ব বা অধিকার এর অর্থঃ- হক্ব বলতে ঐ সব কাজ বুঝানো হয়, যা পালন করা অপরিহার্য। যথা ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদা ইত্যাদি। আলোচ্য হাদিসে মুসলমানের ছয়টি হক্বের কথা বলা হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে মুসলমানের হক্ব ছয়টির মাঝেই সীমাবদ্ধ। বরং উদ্দেশ্য হল মুসলমানের হক্বসমূহের অন্যতম ছয়টি হক্ব। অন্যত্র বিশুদ্ধ হাদিসে আলোচ্য হক্ব ছাড়াও অন্য হক্বের কথা বলা হয়েছে। নিম্নে ক্রমানুসারে হক্ব সমুহ আলোচিত হল-

১) সালাম প্রদান:-

যে সকল হক্ব সমস্ত মুসলমানের মাঝে বিস্তৃত তার প্রথম হল সালাম। যাতে নিহিত আছে সালাম প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ, রহমত, শান্তি ও নিরাপত্তার দোয়া। মুসলমানদের মাঝে সালামের প্রচলন খুবই প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। কারণ, এর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয়। এতে মানুষের অন্তর নিস্কলুষ হয়। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন - "আমি কি তোমাদের এমন কিছুর সন্ধান দেব না, যা তোমরা পালন করলে তোমাদের পারস্পরিক প্রীতি সৃষ্টি হবে? তোমরা পরস্পরের মাঝে সালামের প্রচলন কর।" [সহীহ মুসলীম]

সালামের ফজিলতঃ- এক ব্যক্তি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রসূল! ইসলামে কোন আমলটি সর্বোত্তম? উত্তরে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বললেন, "মানুষকে খাবার খাওয়ানো এবং তুমি যাকে চিনো আর যাকে চিনো না সবাইকে (মুসলিম) সালাম দেয়া।" [বুখারি ও মুসলিম]।

২) দাওয়াতঃ-

মুসলমানদের দ্বিতীয় হক্ব হল দাওয়াত কবুল করা। মানুষের জীবনে এমন কিছু সময় আছে, যেগুলোতে মানুষের আনন্দ-উচ্ছ্বাস স্পন্দিত হয়। যেমন, বিয়ে-শাদি, সন্তান লাভ ও কর্মে সফলতা- ইত্যাদি তখন আনন্দিত ব্যক্তি অন্যান্যকেও এতে সম্পৃক্ত করতে চায়। তাই ওলিমা ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যদের আমন্ত্রণ জানায় এবং আনন্দিত মেহমানদের শুভাগমনে সেই ব্যক্তি খুবই খুশি হয়। সুতরাং, এহেন কাজে অংশগ্রহণ করে মুসলমানকে খুশি করা তার হক্ব। তবে লক্ষ রাখা উচিৎ যদি উক্ত অনুষ্ঠানে শরিয়ত পরিপন্থী কোন কাজ হয় এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তি তা প্রতিহত করার ক্ষমতা না রাখে তাহলে সে অনুষ্ঠানে না যাওয়ায় উত্তম।

ওলিমা ছাড়া যত দাওয়াত আছে সেগুলোতে অংশগ্রহণ মুস্তাহাব। শুধু ওলিমার দাওয়াতে অংশগ্রহণ সম্বন্ধে অনেক ওলামায়ে কেরাম ওয়াজিব বলেছেন। কেননা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "যখন তোমাদেরকে কোন ওলিমায় আমন্ত্রণ করা হয় তখন অবশ্যই আসবে।" [মুসলিম – ২৫৭৬]

৩) সৎ উপদেশঃ-

মুসলমানদের তৃতীয় হক্ব হচ্ছে সৎ উপদেশ প্রদান। সৎ উপদেশ ইসলামের মৌলিক নীতিমালা সমূহের অন্যতম একটি মূলনীতি। কুরআনের বহু আয়াত ও রসূল (সাঃ) এর অনেক হাদিস এর প্রমাণ বহন করে।

নসিহত বা উপদেশের নীতিমালাঃ-

ক) উপদেশ দানকারী সদা-সর্বদা সঠিক উপদেশ দান করবেন। কোন প্রকার ধোঁকা-বাজি করবেন না এবং পরিপূর্ণ উপদেশ দানে কোন প্রকার ত্রুটি করবেন না।

খ) উপদেশ প্রার্থীকে উপদেশ দান করা ওয়াজিব। আর যে প্রার্থী নয়, তাকে উপদেশ দান মুস্তাহাব।

গ) আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি একা হয় তখন উপদেশ হবে গোপনে। বুদ্ধিমত্তার আলোকে, উত্তম পদ্ধতিতে, অত্যন্ত কোমল ও আন্তরিকতার সাথে। কেননা, প্রকাশ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উপদেশ দানের অর্থ হল তাকে অপমান করা এবং উপদেশের ক্ষেত্রে কঠোরতা বর্জন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন- وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ "আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত।" [সূরা আলে ইমরান : ১৫৯]

ছ) সর্বাবস্থায় সমাজকে উপদেশ দানে সচেষ্ট থাকা। কেননা, উপদেশ যেমনিভাবে সমাজকে রক্ষা করে ধ্বংসের হাত থেকে, তেমনিভাবে সৃষ্টি করে পারস্পারিক আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্য-হৃদ্যতা।

৪) হাঁচির উত্তরঃ-

মুসলমানের চতুর্থ হক্ব হল হাঁচির উত্তর দেওয়া। এটা ইসলামের সুন্দরতম বৈশিষ্ট্য। নিম্নে তার হুকুম বর্ণিত হল -

ক) মুসলমান যখন হাঁচি দেবে তখন বলবে আলহামদুলিল্লাহ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেবে তখন বলবে আলহামদুলিল্লাহ; আর শ্রোতা বলবে ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ আপনার প্রতি করুণা করুন) অতঃপর যে ব্যক্তি হাঁচি দিয়েছে, সে বলবে, ইয়াহদিকুমুল্লাহ্ (আল্লাহ আপনাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন)।

৫)অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়াঃ-

মুসলমানদের পঞ্চম হক্ব- অপর মুসলমান অসুস্থ হলে তাকে দেখতে গিয়ে সমবেদনা জানানো। এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে –

ক) অসুস্থ ব্যক্তির সাক্ষাৎ মুসলমানদের হক্ব সমূহের অন্যতম হক্ব। কেননা, সে শারীরিক দুর্বলতার কারণে স্বীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায়। তখন তার এমন কিছুর প্রয়োজন যা তাকে সুস্থতার আশ্বাসের মাধ্যমে শক্তি-সাহস বৃদ্ধি করার ব্যাপারে সাহায্য করবে। এবং তার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবে।

খ) অসুস্থ ব্যক্তির সাক্ষাতে রোগী যেমন উপকৃত হয়, তেমনি উপকৃত হয় সাক্ষাৎকারী। রোগীর উপকার যেমন-তার মনে প্রশান্তি আসে, ক্লান্তি দূর হয় ইত্যাদি। সাক্ষাৎকারীর উপকার যেমন তার পুণ্য লাভ হয়। তার নিজের সুস্থতার কথা স্মরণ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে।

গ) অসুস্থ ব্যক্তির সাক্ষাতের আদব সমূহের একটি হল, তার জন্য হাদিসে বর্ণিত দোয়া পড়া। যেমন-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. رواه البخاری

হে মানুষের প্রভু ! সমস্যা দূর করে দাও। এবং (এই ব্যক্তিকে) শেফা (সুস্থতা) দান কর। নিশ্চয় তুমি একমাত্র শেফাদানকারী। আপনার শেফা ছাড়া কোন শেফা নেই । এমন শেফা দাও, যে শেফা কোন রোগকে ছেড়ে দেয় না। (বুখারি)

(ঘ) সাক্ষাৎকারীদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তাদের সাক্ষাৎ যেন রোগীর কষ্টের কারণ না হয়। তাই উপযুক্ত সময়ে সাক্ষাৎ করবে ও ডাক্তারদের সাজেশন মেনে চলবে।

৬) জানাজার স্বলাতে অংশগ্রহণ করাঃ-

মুসলমানদের ষষ্ঠ হক্ব হল জানাজার স্বলাতে ও কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করা। মৃত্যু আল্লাহর পক্ষ থেকে অবধারিত সত্য। যা প্রত্যেক প্রাণীর দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে পরকালের জীবনের সূচনা করে। এবং এতে মানুষের আমলের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই মৃত ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বেশি অসহায়। সুতরাং ইসলাম জানাজার স্বলাতকে মুসলমানদের হক্ব বলে আখ্যায়িত করেছে। যেন অন্য মুসলমান মৃত ব্যক্তির জন্য রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের জন্য জানাজার স্বলাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দোয়া করে। আর এ কাজে মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য আল্লাহ এতে অনেক পুণ্য রেখেছেন। যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন –

من شهد الجنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. رواه البخاری

যে ব্যক্তি জানাজায় অংশগ্রহণ করল সে এক কিরাত পরিমাণ নেকি পেল। আর যে জানাজা ও দাফন-উভয় কাজে অংশগ্রহণ করবে সে দু কিরাত পরিমাণ নেকি পাবে। প্রশ্ন করা হল, দু কিরাত কি ? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দু কিরাত হল দুই বড় পর্বত সদৃশ।

হাদিসের শিক্ষণীয় বিষয়ঃ-

সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই। হোক ধনী কিংবা গরীব। নিকট আত্মীয় কিংবা দূর আত্মীয়। নিজ এলাকার কিংবা অন্য এলাকার। হোক কালো কিংবা সাদা। একে অপরের সম্পর্ক ঈমান নামক সুতোই গাঁথা। এটা মাথায় রেখে, পারস্পারিক সম্পর্ক মজবুত রাখার স্বার্থে উক্ত হক্বগুলি একে অপরের পালন করতে যেন সচেষ্ট হই আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আমিন।

ইসলামের সোনালী পরশে ধন্য হয়েছিলেন যারা!

আবু তাজরিয়ান

ভূমিকা:- নবী করীম (সাঃ) মহান আল্লাহর নির্দেশে ওহী ভিত্তিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ দিয়ে এক সর্বোত্তম মানবগোষ্ঠী প্রস্তুত করে তাঁদের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নন্দিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শুভ, কল্যাণ ও মানবিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ নান্দনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা আকাশের নীচে এবং যমীনের বুকে ইতিপূর্বে কখনোই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই ওহীভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রে মানুষের মনে একমাত্র আল্লাহর ভয় ব্যতীত আর অন্য কোনো ভয় অবশিষ্ট ছিল না। ইসলাম আগমনের পূর্বে ঐ সমাজে মানুষের জান-মালের কোনো নিরাপত্তা ছিল না, কথায় কথায় যুদ্ধ নামক সন্ত্রাস মানব সমাজকে গ্রাস করতো। পথে প্রান্তরে নারী ধর্ষিতা হতো। শক্তি প্রয়োগ করে অপরের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হতো এবং নারী ও শিশুদেরকে ধরে নিয়ে দাস-দাসী হিসাবে বিক্রি করা হতো। সেই বর্বর সমাজের লোকগুলো ইসলামের ছায়াতলে ঈমানের স্পর্শে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হলো। যাদের স্বভাব ছিল আগ্রাসী, তারা জমাট বাঁধা বরফের মতোই শান্ত হয়ে গেলো। অপরের সম্পদ লুণ্ঠন করাই ছিল যাদের কাজ, তারা হয়ে গেলো অপরের সম্পদের পাহারাদার। নারীর কোমল দেহকে যারা খুবলে খেতো, তারাই হয়ে গেলো নারীর সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষাকারী জানবাজ সৈনিক।

পৃথিবীতে ইসলাম ব্যতীত এমন কোনো আদর্শ আইন কানুন ও মতবাদের অস্তিত্ব নেই, যা মানুষকে একান্ত গোপনে নির্জনে করা নিজের অপরাধ প্রকাশ করে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ দূরে থাক অপরাধ প্রকাশ পেলে কিছু দিনের জন্যে কারাগারে যেতে হবে, এ আতঙ্ক তাড়িত হয়ে অপরাধী তার অপরাধ গোপন করার সকল চেষ্টা করে। কিন্তু ইসলামী সমাজের চিত্র এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। নন্দিত আদর্শ ইসলাম তার একনিষ্ঠ অনুসারীর হৃদয়ে আত্মজিজ্ঞাসা ও বিবেকের দংশন এমনভাবে সৃষ্টি করেছিলো যে, অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড জেনেও সে শাস্তি গ্রহণ করে পরকালে পরিচ্ছন্ন অবস্থায় আল্লাহর আদালতে দণ্ডায়মান হবার আকুতি নিয়ে নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এসেছিলো।

হযরত মা'ইম ইবনে মালিক (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর নিকট এসে অনুতাপ মিশ্রিত কণ্ঠে জানালেন, 'আমি অবৈধ পন্থায় যৌনক্রিয়া করেছি, আমার প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করুন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও'। লোকটি চলে গেলো কিন্তু মনে স্বস্তি পেলো না। তাঁর জীবনে শান্তি যেন তিরোহিত হয়ে গিয়েছে। বিবেক তাঁকে ভর্ৎসনা করছে, কিয়ামতের দিনের সেই আযাব তো সে সহ্য করতে পারবে না। পুনরায় লোকটি রাসূল (সাঃ) এর নিকট সেই পূর্বের অনুরূপ আবেদন জানালো। রাসূল (সাঃ) তাঁকে আবার ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে তিনবার লোকটিকে ফিরিয়ে দেয়ার পরে চতুর্থবার লোকটি এসে যখন সেই একই আবেদন জানালো, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই লোকটি উন্মাদ নয় তো?'

লোকেরা বললো, 'না, লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ'। রাসূল (সাঃ) আবার জানতে চাইলেন, 'লোকটি কোনো ধরনের নেশা করেনি তো?' লোকজন জানালো, 'না, লোকটি কোনো নেশা করেনি'। এরপর লোকটির আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে জানা হলো। এরপর লোকটির ওপর দণ্ড প্রয়োগ করা হলো অর্থাৎ লোকটিকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হলো। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা মা'ইম ইবনে মালিকের জন্য মাগফিরাত কামনা করো । কারণ সে এমন তাওবা করেছে যে, তাঁর তাওবা সমস্ত মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিলে তা যথেষ্ট হতো'।

ইজদ গোত্রের একজন ঈমানদার নারী নফসের ধোকায় পড়ে অবৈধ পন্থায় যৌনক্রিয়া করেছিল। সম্বিত ফিরে পাওয়ামাত্র আল্লাহর ভয়ে সেই নারী থর থর করে কেঁপে উঠলো। আহার নিদ্রা সব তার বন্ধ হয়ে গেলো। কিয়ামতের ময়দানে আপন রব আল্লাহর সামনে সে কোন্ মুখ নিয়ে উঠে দাঁড়াবে? ছুটে এলো আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) কাছে। অকপটে সে নিজের অপরাধের স্বীকৃতি দিলো। রাসূল (সাঃ) তাঁকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু সেই নারী তাঁর প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করার জন্য বার বার আবেদন জানাতে থাকলেন। অবশেষে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সেই নারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে তুমি কি গর্ভবর্তী হয়েছো?' অনুতাপের সাথে নারী জানালো সে গর্ভবতী হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) অনুতাপের অনলে নিঃশেষে জ্বলে খাঁটি সোনায় পরিণত হওয়া সেই নারীকে জানালেন, 'গর্ভের সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

আক্ষেপ করতে করতে সেই নারী চলে গেলো। তাঁকে প্রহরা দেয়ার জন্য কোনো প্রহরাদার বা গোয়েন্দা নিয়োগ

করা হলো না। দশমাস পরে সন্তান প্রসব হলো কিন্তু সেই নারীর মন থেকে অনুতাপের আগুন একটুও নির্বাপিত হয়নি বা অনুশোচনার তাপের মাত্রা হ্রাস হয়নি। সন্তান কোলে সেই নারী পুনরায় আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) কাছে এসে দণ্ড প্রয়োগের আবেদন জানালেন। রাসূল (সাঃ) নারীকে জানালেন, 'তোমার দুধে ঐ সন্তানের দুই বছর হক রয়েছে। সেই হক তুমি আদায় করবে এবং সন্তান অন্য কিছু আহার না করা পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে'। সেই নারীর দুই গণ্ড বেয়ে অনুতাপের অশ্রু বেয়ে পড়ছে। চলে গেলো সেই নারী এবং নির্দিষ্ট সময়ে সন্তানকে রুটি খাওয়া অবস্থায় এনে রাসূলকে দেখিয়ে আবেদন জানালো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমার সন্তান দুধ পান ত্যাগ করেছে, এই দেখুন সে রুটি খাচ্ছে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, এই সন্তানকে লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে?' একজন দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূল (সাঃ) ঐ লোকটির দায়িত্বে সন্তানকে দিয়ে আবক্ষ মাটিতে সেই নারীকে গেড়ে তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন। মহিলার প্রতি দন্ড প্রয়োগ করা হচ্ছে। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রাঃ) মহিলার কাছে গিয়ে তাঁর মাথায় একটি পাথরের আঘাত করলেন। মস্তক ফেটে মগজ আর রক্ত ছিটকে এসে হযরত খালিদের দেহ স্পর্শ করলো। তিনি মহিলার প্রতি ভর্ৎসনা করলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তা শুনে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, "তোমরা যদি পৃথিবীতে কোনো জান্নাতী নারী দেখতে চাও, তাহলে এই নারীকে দেখে নাও। কারণ সে এমনভাবে আল্লাহর দরবারে তওবা করেছে যে, সেই তওবা সকল মদিনা বাসীর জন্য যথেষ্ট এবং মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন"।

ইসলামী সাম্রাজ্যের খলীফা হযরত উমার (রাঃ) বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক, সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে তাঁর নাম শোনামাত্র অপরাধীর কলিজা থর থর করে কেঁপে ওঠে। তাঁর শাসনাধীন সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি নাগরিক রাতে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে। অভাবহীন অবস্থায় নিরাপত্তার সাথে নিশ্চিন্তে ঘুমায়। আর স্বয়ং খলীফা নির্ঘুম যামিনী অতিবাহিত করেন। কোনো একটি নাগরিকও যদি সামান্যতম অসুবিধা অনুভব করে, তাহলে তাঁকেই কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর দরবারে কঠিন জবাবদীহী করতে হবে। তিনি দেশের অবস্থা জানার জন্য শুধু পর্যবেক্ষণ দলের রিপোর্টের ওপরই নির্ভর করেন না। স্বয়ং তিনি রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে দেশের নাগরিকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে থাকেন। গভীর রাতে তিনি মদ্বীনার এক এলাকা অতিক্রম করছিলেন। একটি বাড়ি থেকে গভীর রাতে কথাবার্তার মৃদু শব্দ তাঁর কানে প্রবেশ করলো। থমকে দাঁড়ালেন তিনি। শুনতে পেলেন, মা তার মেয়েকে ডেকে বলছে, 'মা, দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করো, তাহলে অধিক পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে'। মেয়ে জবাবে বললো, 'এটা সম্ভব নয় মা। কারণ খলীফা আদেশ দিয়েছেন, দুধে কেউ পানি মেশাতে পারবে না'। মা বললেন, 'খলীফা আদেশ দিয়েছে তো কি হয়েছে? এখানে তো আর কেউ দেখতে আসছে না'। মেয়ে মায়ের কথার প্রতিবাদ করে বললো, 'একজন মুসলমান। হিসেবে খলীফার আদেশ অনুসরণ করা অবশ্যই উচিত মা। তা ছাড়া এখানে কেউ না দেখলেও তো মহান আল্লাহ দেখছেন। তাঁর চোখে কোনো কিছুই গোপন থাকবে না। আমি দুধে পানি মেশাতে পারবো না'। খলীফা স্বয়ং মা ও মেয়ের এসব কথোপকথন নিজ কানে শুনলেন এবং মেয়েটিকে পুরস্কৃত করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন।

ইসলামের ইতিহাস অধ্যায়ন করলে এরকম অজস্র উদাহরণ পাবেন, সেখান থেকে খুব সহজেই অনুমান করতে পারবেন যে, ইসলামের পরশ কিভাবে মানুষের অন্তরের পূর্ণাঙ্গ পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে ইসলাম তো এখনো আছে তাহলে মানুষের এরূপ পরিবর্তন বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না কেন? আসলে ইসলামকে আমরা কিভাবে নিচ্ছি এটি একটি বড় বিষয়। ইসলাম হলো এক সঞ্জীবনী ওষুধের মতো, যা ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়, ব্যবহার না করে টেবিলে রেখে দিয়ে উপকার পাওয়া যায় না। আমাদের সালফে-স্বলেহীনদের বিষয়টা এমন ছিল যে, তাঁরা ইসলামের বিধি-বিধান শোনার সাথে সাথে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু, আজকে আমাদের ক্ষেত্রে বিষয়টা একেবারে ভিন্ন রকমের, অনেকেই আছে ইসলাম তো বোঝেনা এবং বোঝার চেষ্টাও করেনা, ইসলামের জ্ঞান থেকে সহস্রমাইল দূরে অবস্থান করছে। আবার কিছু মানুষ ইসলামের জ্ঞান অর্জন করে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য। তবে হ্যাঁ, এখনো কিছু মানুষ আছে যারা ইসলামের জ্ঞান অর্জন করে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টায় রত রয়েছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমদের মত ইসলাম বোঝার এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন ইয়া রব্বাল আলামীন।

"সত্যবাক"
এ অ্যাড দেওয়ার জন্য
যোগাযোগ করুন -
9635779370

তাওবাহ : গুরুত্ব ও পদ্ধতি

রাহাত ইসলাম

তাওবার একাধিক অর্থ রয়েছে, যেমন: অনুতপ্ত হওয়া বা আন্তরিক অনুশোচনা বা পাপ কাজ থেকে ফিরে আসা। যে সকল কথা ও কাজ মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয় সেসব ঘৃণ্য কাজ থেকে ফিরে আসার পদ্ধতিকেই তাওবা করা বলা যেতে পারে। মানুষ সৃষ্টিগতভাবে অপরাধপ্রবণ তাই নানা পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। আর এর মধ্যেই কিছু কিছু পাপ আছে যেগুলো নেক আমলের দ্বারা মুছে যায়। আর কিছু কিছু এমন পাপ আছে যেগুলোর জন্য বিশেষভাবে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হয়। যেমন সাগিরা, কাবিরা, শিরক্। তবে আমাদের একটি বিষয় জানা দরকার যে, সমস্ত রকমের পাপকাজ ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখেন একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা। তাই আমাদের ক্ষমা চাইতে হলে একমাত্র আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। অন্য কারোর কাছে না। আল্লাহ হলেন এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

এবার মূল বিষয় হচ্ছে যে, তাওবার গুরুত্ব কী? এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন: কোন বান্দা যখন ভুল করার পর আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তাকে ক্ষমা করে দিই। অতএব তাঁর প্রতি আমি খুশি হয়ে তাকে সুপথে পরিচালিত করি। আল্লাহ সূরা তাহরীমের ৮ নম্বর আয়াতে বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা। সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলোকে মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে" (সুবহানাল্লাহ)। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)- এর সানাদে রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন: আমার উপর বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি তার সাথে আছি। সে যেখানেই আমাকে স্মরণ করে আমি তার সাথে আছি। আল্লাহর কসম, শূণ্য মাঠে তোমাদের কেউ হারানো প্রাণী পাওয়ার পর যে আনন্দিত হয় আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবার কারণে এর চেয়েও বেশি আনন্দিত হন।

রাসুল (সাঃ) বলেন যে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'যদি কেউ এক বিঘত সমান আমার দিকে অগ্রসর হয় তাহলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যদি কেউ এক হাত সমান আমার প্রতি অগ্রসর হয়, তাহলে আমি এক গজ সমান তার প্রতি অগ্রসর হই। যদি কেউ আমার দিকে পায়ে হেঁটে আসে তবে আমি তার দিকে দৌড়ে আসি' (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৮৪৫)।

অন্যথায় যেমন বলা হয়েছে: রাসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে সাইয়েদুল ইস্তেগফার পড়বে সে যদি সন্ধ্যার মধ্যে মৃত্যু বরণ করে তবে সে জান্নাতে যাবে, আর যদি কোন ব্যক্তি সন্ধ্যায় সাইয়েদুল ইস্তেগফার পড়ে আর সকালের পূর্বেই যদি মারা যায় তবে সে জান্নাতে যাবে। সাইয়েদুল ইস্তেগফার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার একটি অন্যতম দোয়া।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এত দয়ালু যে, কোনো বান্দা যদি পাপ কাজ করার পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তবে ক্ষমা তো করবেনই, তার সঙ্গে পুরস্কৃত করার কথাও ঘোষণা করেছেন। হায়! তারপরেও আমরা আজ উদাসীন! পাপ কাজ থেকে ফিরে এসে আল্লাহর দিকে ধাবিত হচ্ছি না! পাপ কাজ থেকে ফিরে এসে তাওবা করা প্রতিটি মানুষের অবশ্যই কর্তব্য।

তাওবা করার পদ্ধতি:

আমরা কীভাবে তওবা করলে আল্লাহ মেহেরবান আমাদের তওবা কবুল করবেন? এই সম্পর্কে বলে রাখি যে, আল্লাহ আমাদের যেভাবে ক্ষমা চাইতে বলেছেন ও রাসুল (সাঃ) যেভাবে ক্ষমা চাইতে বলেছেন সেভাবেই আমাদের ক্ষমা চাইতে হবে, তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের তওবা কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ।

আমরা কীভাবে তাওবা করবো তা আল্লাহ আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের শিখিয়েছেন:

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অতঃপর আদম তার রবের পক্ষ থেকে কিছু বাণী পেল, ফলে আল্লাহ তার তাওবা কবূল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবূলকারী, অতি দয়ালু।(২:৩৭)

এছাড়া আরও বাণী সুরা আরাফের ২৩ নম্বর আয়াত ও সূরা কাসাসের ১৬ নম্বর আয়াতে উল্লেখ রয়েছে:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

তারা বলল, "হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব"।(৭:২৩)

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

সে বলল, "হে আমার রব, নিশ্চয় আমি আমার নফসের প্রতি যুলুম করেছি, সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন"। অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৮:১৬) আবার আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অন্যত্র বলেন যে:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا توبوا إِلَى اللَّهِ تَوبَةً نَصوحًا عَسى رَبُّكُم أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئاتِكُم وَيُدخِلَكُم جَنّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِهَا الأَنهارُ يَومَ لا يُخزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذينَ آمَنوا مَعَهُ نورُهُم يَسعى بَينَ أَيديهِم وَبِأَيمانِهِم يَقولونَ رَبَّنا أَتمِم لَنا نورَنا وَاغفِر لَنا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, নবী ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সেদিন আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, "হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বক্ষমতাবান।"(৬৬:৮)

খাঁটি তওবা কী?

বিশুদ্ধ বা নিষ্ঠাপূর্ণ তওবা হল, (ক) তওবা একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে। (খ) যে গুনাহ হতে তওবা করা হচ্ছে, তা সত্বর ত্যাগ করতে হবে। (গ) এই গুনাহ করে ফেলার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে। (ঘ) আগামীতে এই গুনাহ 'আর করব না' বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। (ঙ) যদি এই গুনাহের সম্পর্ক কোন বান্দার অধিকারের সাথে হয়, তবে যার অধিকার নষ্ট হয়েছে, তার সাথে মিটমাট করে নিতে হবে। যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যথায় কেবল মৌখিক তওবা করার কোন অর্থ হয় না।

আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাঃ) কে মেরাজের রাতে শিখিয়ে দেন তওবা কীভাবে করতে হবে। তা উল্লেখিত আছে সুরা বাকারার শেষ ২৮৫ ও ২৮৬ নং আয়াতে।

রাসূল (সাঃ) বলেন, أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الَّذِىْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ "আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ছাড়া ইবাদতের আর কোন যোগ্য উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আমি তাঁর কাছে তাওবা করছি।"

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেছেনঃ

"যেই ব্যক্তি এই দোয়া পড়বে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন, যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলাতক আসামী হয়"। (অর্থাৎ, সে যদি বড় রকমের গুনাহগার হয়, তবুও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন।) সূত্রঃ তিরমিযী ৪/৬৯, আবুদাউদ ২/৮৫, মিশকাত হা/২৩৫৩,

কোন সময় আল্লাহর কাছে তওবা করব বা করলে বেশি গ্রহনযোগ্য হবে। এই সাপেক্ষে রাসূল (সাঃ) বলেন: আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন: প্রত্যেক রাতে যখন রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন- আমিই একমাত্র বাদশাহ্! কে এমন আছ আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে এমন আছ আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তাকে দান করব। কে এমন আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব, ফজরের আলো ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এরূপ বলতে থাকেন। সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৬৫৮

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

আমরা সকলেই যদি আল্লাহর কাছে মাথানত করি, পাপের জন্য অনুশোচনাবোধ করি, আল্লাহর শিখানো ভাষায় আমরা যদি অন্তরের অন্তরস্থল থেকে তওবা করি তবে আল্লাহ আমাদের তাওবা কবুল করবেন, ইনশাআল্লাহ। আর আমরা যদি পাপ কাজ থেকে না ফিরে আসি আল্লাহর পথে তাহলে আমাদের আবাস স্থল হবে জাহান্নাম। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। তাই আসুন আমরা আজকে অনুতপ্ত হয়ে চোখের জল ঝরিয়ে আল্লাহর কাছে এই বলে ফরিয়াদ করি যে, আল্লাহ আমরা যা ভুল করেছি শয়তানের ওয়াসওয়াসায়, প্রকাশ্যে বা গোপনে, জেনে বা না জেনে ইত্যাদি গুনাহসমূহ থেকে আমাদের ক্ষমা করে দাও। অতএব আমাদের সুপথে পরিচালিত করো, তুমি ছাড়া কে আছে যে আমায় ক্ষমা করবে! হে আল্লাহ তোমার গোলামের কোন অভাব নাই কিন্তু আল্লাহ তুমি ছাড়া আমাকে ক্ষমা করার কেউ যোগ্য নাই। তাই আমি তোমার কাছে হাত উত্তোলন করছি, তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও। তুমি গফুর গাফফার, তুমি রহিম রহমান।

ইউনিফর্ম সিভিল কোড

ইউনিফর্ম সিভিল কোড (UCC) সমগ্র দেশের জন্য একটি অভিন্ন আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কথা বলে। এই অভিন্ন আইন, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ এবং এই ধরণের অন্যান্য বিষয়ে সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য হবে।

এই বিধি চালু হলে দেশে কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠীর পার্সোনাল ল বা ব্যক্তিগত আইন আর বলবৎ থাকবে না। যেমন এখন বিয়ের ন্যূনতম বয়স, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি নিয়ে একাধিক আইন ও বিধান রয়েছে। সরকারি নিয়ম হল, মেয়ের ১৮ এবং ছেলের ২১ বছর না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেওয়া যাবে না। কিন্তু মুসলিম পার্সোনাল ল অনুযায়ী ১৫ বছরের পরই মেয়েদের বিয়ে সিদ্ধ। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে সংখ্যালঘুদের এই পার্সোনাল ল'য়ের বিধান আর থাকবে না।

ইউনিফর্ম সিভিল কোডের কথা ভারতীয় সংবিধানের ৪৪ নম্বর ধারার পার্ট ৪-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ৪৪ নম্বর ধারায় লেখা লেখা আছে, "ভারতের সমগ্র ভূখণ্ড জুড়ে নাগরিকদের জন্য একটি অভিন্ন নাগরিক আইন সুরক্ষিত করার চেষ্টা করবে রাষ্ট্র।"

‘বেষ্ট অফ ক্রিয়েচারস’ হতে চান না?

রেজাউল করিম

অনেকের মনেই এই প্রশ্ন: প্র্যাকটিসিং মুসলিমরা কেন প্র্যাকটিস করে এবং কিভাবে প্র্যাকটিসকে ধরে রাখে? আমি তো সবই বুঝি কিন্তু কিছুই করা হয়ে উঠেনা। তার জবাব দেয়ার প্রচেষ্টা হিসেবেই এই লেখা-

আসলে এর জবাব তিনটা পয়েন্ট এর মধ্যে:

১. আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? এটা বুঝতে পারা। মূলত আমরা আল্লাহর দাস এবং আল্লাহর দাসত্ব (ইবাদত) করার জন্যই আমাদেরকে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে। আনন্দ-উল্লাস, মাস্তি করার জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়নি।

“আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।” (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬)

২. লাইফ সফলতা আসলে কি? এটা ফিল করতে পারা। আপনার জীবনের সফলতা আসলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্যে নিহিত। ক্যারিয়ার বিল্ডআপের জন্য পাগলের মতো ছুটা, কর্পোরেট কোম্পানীতে জব করা, ‘বেস্ট স্পাউস’ পাওয়া, একটা ফ্ল্যাট আর একটা গাড়ি আর কয় কাঠা প্লট শহরে নিশ্চিত করা, অর্থ- বিত্তের প্রতিযোগিতায় মত্ত হওয়া’ — এগুলো কোন ‘এ্যাবসোলিউট সাকসেস’ বা ‘পরিপূর্ণ সফলতা’ নয়। এ্যাবসোলিউট সাকসেস হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’লাকে খুশী করতে পারা। আল্লাহকে খুশী করতে পারার একমাত্র উপায় হল শয়তানের মত বেশী না বুঝে, তাঁর ‘একান্ত ওবিডিয়েন্ট বান্দা’ হওয়া এবং ‘নিজের ‘ডিসায়ার’ এর বিপরীতে’ তাঁর আদেশ-নিষেধ জীবনের সবক্ষেত্রে মেনে চলা। অবশ্যই ভুল হলে তার উপর বড়াই না করে ইন্সট্যান্টলি ক্ষমা চাওয়া।

৩. কিন্তু তাহলে তো দুনিয়ায় চলা যাবে না ? পদে পদে বাঁধা পেতে হবে? আপনি যখন দুনিয়ার বিপরীতে আল্লাহ্‌র বিধান মাননেওয়ালা হয়ে যাবেন তখন আল্লাহ্‌ও ইব্রাহীম (আঃ) এর মতো আপনাকে পদে পদে সাহায্য করবেন। আপনি আপনার দুনিয়ার সময় আল্লাহর জন্য ব্যয় করুন, আল্লাহ্ আপনার সব কাজ ‘উদ্ধারের’ ব্যবস্থা করে দিবেন। এজন্য শুধু আল্লাহ্‌র উপর আস্থা রাখাই যথেষ্ঠ। “যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর আস্থা রাখে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট।” (সূরা ত্ব-লাক্ব- ৩)

মনে করেন আপনাকে এমন চাকুরি করতে হয়, যেখানে ‘মিথ্যা বলাই বসের নির্দেশ’। সেক্ষেত্রে আপনি আল্লাহ্‌র উপর আস্থা রেখে যখন এমন চাকরি ছেড়ে দিবেন, দেখবেন আল্লাহ্ ঠিকই আপনাকে এর থেকেও ভাল ব্যবস্থা করে দেবেন। এমন হাজার হাজার ঘটনার সাক্ষ্য আপনি প্র্যাকটিসিং মুসলিমদের কাছ থেকে পাবেন। [নাহলে এই দুনিয়ায় প্রাকটিসিং মুসলিমরা টিকে আছে কিভাবে? এমনি এমনি?] আর ইব্রাহীমের (আঃ) প্রতি আল্লাহ্‌র সাহায্য এর উদাহরণ ভুলে যাবেন না। তবে অবশ্যই আপনাকে মিনিমাম ‘সকল কবীরাহ গুনাহ মুক্ত’ এবং ‘সব ফরজ পালন করনেওয়ালা’ হতে হবে। আপনার ছোট থেকে বড় সব সমস্যা সমাধানের জন্য কোন হারামে লিপ্ত না হয়ে আল্লাহ্‌র কাছেই চান, আল্লাহ্‌ই যথেষ্ঠ।

এই তিনটা পয়েন্ট যদি আপনার মাথায় ঢুকে যায়, তাহলেই আপনি একজন প্র্যাকটিসিং মুসলিম হয়ে যাবেন ।

৪. আর আপনার মনে হতে পারে, যে বর্তমান দুনিয়ায় ইসলাম পালন করা মানে পুরাই ‘গুরাবা’(স্ট্রেন্জার) হয়ে যাওয়া, সম্পূর্ণ সমাজের বিপরীত চলা। এটা তো ব্যাডলাক। পুরোই ভুল কনসেপ্ট, আসলে এটা আপনার সৌভাগ্য যে আপনি শেষ জমানায় এমন একটা চান্স পেয়েছেন, নিজেকে আল্লাহ্‌র সামনে প্রমাণ করার জন্য। এখনকার দুনিয়ার অবস্থা অনেকটা বদর-পূর্ব অবস্থার মতো, মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত কঠিন। হাদীসে বলা আছে এই যুগে যারা দ্বীনের উপর অটল থাকবেন, তারা ৫০ জন মুসলিম এর সমতুল্য হবেন। সাহাবারা জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের ৫০ জন, নাকি তাদের ৫০ জন? রসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের ৫০ জন। (মানে সাহাবাদের ৫০ জন)। তাই আপনি আসলে কত বড় রিওয়ার্ড পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন তা চিন্তা করেছেন? আমাদের তো আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া জানানো উচিত এমন একটা সুযোগ পাবার জন্য। একটা পারফেক্ট ইসলামী সোসাইটি জন্ম নিলে এই সুযোগ তো পেতেন না, তাইনা?

আরও একটা ব্যাপার খেয়াল রাখা, নিজের উত্তম আমল নিয়ে গর্ব অহংকার না করা (কেউ জানেনা, তার কতটুকু এক্সেপ্টেড হচ্ছে), বরং আল্লাহ্‌র সামনে নিজের গুণাহকে মনে করে বিনয়ী হওয়া। এক শায়খ জুমার খুতবায় বলছিলেন একটা কথা, এখনও আমার কানে ভাসে ‘ The more you can put yourselves down in

☞☞☞পরবর্তী অংশ ১৭ নং পাতায়

মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের কারণ ও উত্তরণের উপায়

আলমগীর হোসেন

ভূমিকা:-

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ এক চরম ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে দিনকাল অতিবাহিত করছে। পুরো বিশ্বে মুসলিমরা আজ সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত ও নির্যাতিত। যে জাতি একসময় পুরো বিশ্ব শাসন করেছে আজকে সেই জাতি শাসিত, যে জাতি একসময় ছিল বিজয়ী সেই জাতি আজকে পরাজিত, যে জাতি একসময় বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিতে, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে পুরো বিশ্বকে আলোর দিশা দেখিয়েছে, সেই জাতি আজ নিজেই দিশাহারা। এহেন পরিস্থিতিতে মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে আত্মসমীক্ষা ও আত্মপর্যালোচনা করা উচিত। কেন আজকে মুসলিমরা লাঞ্ছিত, অপদস্থ, নির্যাতিত, অত্যাচারিত? কুরআন হাদিস অধ্যয়ন করলে এর উত্তর আমরা সহজেই পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। মুসলিম উম্মাহর উপর মুসিবত, লাঞ্ছনা ও বিপর্যয়ের জন্য যে কারণগুলো কুরআন ও হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে এই প্রবন্ধে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করলাম ।

১) ইসলামের বিধানাবলীর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন

"হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামের মধ্যে পুরোপুরি দাখিল হও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আদেশ আসার পরও যদি তোমরা পথভ্রষ্ট হও, তাহলে জেনে রেখ! নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী।"-(সূরা বাকারা- আয়াত ২০৮-২০৯) তিনি আরও বলেন: "তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করো? অতএব তোমাদের যারা এমন করে তাদের পার্থিব জগতে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ছাড়া আর কী প্রতিদান হতে পারে? এবং ক্বিয়ামাতের দিন তারা কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে, আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল নন"-(সূরা বাকারা- আয়াত-৮৫)। উক্ত আয়াতগুলোতে দুটো বিষয় আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়েছে। এক. পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। দুই. আংশিক ইসলাম পালন করলে তার জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। বর্তমানে মুসলিমদের অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ইসলাম সম্পর্কে বেশিরভাগ মুসলিমদের সংকীর্ণ ধারণা রয়েছে। অনেক মুসলিম মনে করে দুই ঈদের নামাজ এবং কিছু আচার অনুষ্ঠানের নাম ইসলাম, কিছু মুসলিম পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে মনে করে এটা ইসলাম, কিছু মানুষ মনে করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, বছরের রোজা, কুরবানী এগুলোর সমষ্টি হলো ইসলাম। সত্যি কথা বলতে ইসলাম আমাদের কাছে আজ হাতি দেখার মতো হয়ে গিয়েছে। একটি গ্রামে একবার হাতি এলো এবং গ্রামবাসীরা হাতি দেখতে হাজির হলো, ভিড়ের মাঝে কিছু মানুষ হাতির লেজ দেখে এসে বলল হাতি দড়ির মতো দেখতে আবার কিছু মানুষ হাতির কান দেখে বলল হাতি কুলোর মত দেখতে। আজকে ইসলামটাও আমাদের কাছে এরূপ হয়ে গিয়েছে, ইসলামের যে যেটুকু দেখছে সেটাকেই মনে করছে এটাই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম। আবার কিছু মুসলমান ইসলাম সম্পর্কে জানলেও সে তার সুবিধামতো ইসলাম পালন করে, ইসলাম পালন করতে গিয়ে কোনো জায়গায় নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে সে তখন নিজের স্বার্থটাকে প্রাধান্য দেয় এবং ইসলামকে বাইপাস করে চলে। বর্তমানে আজকে ইসলামের ব্যাপক ধারণার সঙ্গে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার চেষ্টা খুব অল্প সংখ্যক মানুষেরই রয়েছে। বেশিরভাগ মুসলমান ইসলামের কিছু অংশ মানে আর কিছু অংশ জানতে-অজানতে ছেড়ে দেয়। ইসলামের বিধি-বিধানগুলি পূর্ণরূপে পালন করার চেষ্টা করলে তাকে গোঁড়া বা মৌলবাদী বলার মতো নামধারী কিছু মুসলমানও খুঁজে পাওয়া যায়। আজকে আমাদের উপর যে মুসিবত ও লাঞ্ছনা নেমে এসেছে তার অন্যতম একটি বড় কারণ হলো ইসলামের কিছু অংশ মানা ও কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া।

২) দুনিয়ার মোহ ও মৃত্যুভীতি

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ এমন এক সময় আসবে, যখন তোমাদের নিধনের জন্য বিভিন্ন (কাফের) গোষ্ঠী একে অপরকে আহবান করবে। ঠিক যেমন অভুক্ত খাদকদের আহবান করা হয়, (মুখরোচক খাবারের) পাত্রের প্রতি। তখন একজন বলে উঠলেন, আমাদের সংখ্যাসল্পতার কারণে কি সেদিন এমন দুরাবস্থা হবে? ইরশাদ হলো- বরং সেদিন সংখ্যায় তোমরা অনেক বেশি হবে, কিন্তু অনেকটা প্রবাহমান পানির ফেনার মতো (পরিমাণে অধিক অথচ অন্তঃসারশূন্য) থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রতি ভয়-ভীতি তুলে দিবেন (তারা তোমাদের খুবই নগণ্য ভাববে)। আর

তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহান' সৃষ্টি করে দিবেন। জনৈক প্রশ্নকর্তা জানতে চাইলেন- 'ওয়াহান' কি? ইরশাদ হলো- দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুভীতি। (আবু দাউদঃ ৪২৯৭)

হযরত মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন: 'দুটি ক্ষুধার্ত বাঘকে ছাগলের পালের মধ্যে ছেড়ে দিলে তারা পালের এই পরিমাণ ক্ষতি করে না যে পরিমাণ মানুষের সম্পদের লোভ ও সম্মানের লিপ্সা তার দ্বীনকে ক্ষতি করে।' (জামে তিরমিযি -২৩৭৬)

হযরত কাব ইবনে ইয়াদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেক জাতির জন্য একটা ফিতনা আছে। আমার উম্মাতের জন্য ফিতনা হলো সম্পদ।" -(তিরমিযী)

মুসলিমদের উপর বিপর্যয় আপতিত হওয়ার অন্যতম প্রধান একটি কারণ হলো দুনিয়ার মোহ। দুনিয়ার সম্পদের ফিতনায় আজকে আমরা নিপতিত। জনসাধারণ থেকে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান প্রত্যেকেই এই ফিতনায় জর্জরিত। প্রত্যেকেই চায় নিরাপদ স্থানে থেকে দুধে ভাতে থাকতে। তাইতো ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষ নিয়ে কথিত সুপারপাওয়ারদের বিরুদ্ধে কেউ এগিয়ে আসছে না। প্রত্যেকেই সম্পদের মোহে এতটাই আচ্ছন্ন যে, তারা ভাবছে যদি বিরোধিতা করতে যায় তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে তথাকথিত সুপারপাওয়াররা উঠে পড়ে লাগবে এবং আমাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে, শাসন ক্ষমতায় আর থাকা হবে না এবং বিলাসবহুল জীবনযাপন আর সম্ভব হবে না। তাই এই সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানরা আক্রান্ত মুসলিমদের পাশে দাঁড়াতে সাহস পায় না। প্রায় ২০০ কোটি মুসলমানের মধ্যে বেশিরভাগই দ্বীনি জ্ঞান, আল্লাহ ভীতি, আল্লাহ ভরসা, দৃঢ়তা, সাহসিকতা সর্বোপরি ঈমানের দিক দিয়ে অতীব দুর্বল। ফলস্বরূপ সংখ্যা বেশি হলেও মুসলিমরা যেন সমুদ্র-স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মতো ওজনহীন। তাছাড়া আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেওয়ায় অন্তরে ওয়াহান তথা ভীরুতা প্রবেশ করেছে ফলতঃ দ্বীনের জন্য নিজেদের জান-মাল কুরবানী করা একটি অলিক কল্পনায় পরিণত হয়েছে।

৩) ন্যায়ের উপদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ পরিত্যাগ

আজকে মুসলিমদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে তার সবচেয়ে বড় একটি কারণ হলো 'আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার' অর্থাৎ ন্যায়ের উপদেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ পরিত্যাগ করা। মুসলিম উম্মাতের যে মর্যাদা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন তা কুরআনে আল্লাহ তাআলা এইভাবে বলছেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে।" (আলে ইমরান-১১০)। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত এই কাজ থেকে মুসলিম উম্মাহ আজ অনেক দূরে অবস্থান করছে ফলস্বরূপ আমাদের ওপর নির্যাতন, লাঞ্ছনা ও জালেম শাসকের শাসন চেপে বসেছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার" করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং না করলে তার পরিণাম সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করেছেন।

হযরত হুজাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা সৎকর্মের আদেশ করতে থাক এবং অন্যায় কর্মের বাধা দিতে থাক। অন্যথায় খুব শীঘ্রই হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর আযাব নাযিল করবেন। তখন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আযাব হটিয়ে দেওয়ার জন্য দু'আ করবে। কিন্তু তিনি কবুল করবেন না।" -(তিরমিযীঃ হাদীস নং ২/৩৯)

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "তোমরা অবশ্যই মা'রূফ এর আদেশ করবে, মুনকার থেকে নিষেধ করবে, কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহ প্রদান করবে, অন্যথায় আল্লাহ যে কোন আযাবে তোমাদের সকলকেই ধ্বংস করবেন কিংবা তোমাদের মধ্য হতে সর্বাধিক পাপাচারী, অন্যায়কারী ও যালিম লোকদেরকে তোমাদের ওপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিবেন। এ সময় তোমাদের মধ্যকার নেককার লোকেরা মুক্তিলাভের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া ও কান্নাকাটি করবে; কিন্তু তাদের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।"– (মুসনাদে আহমদ)

হযরত হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : "সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ করবে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের উপর আযাব নাযিল করবেন। তখন তোমরা দোয়া করলেও তিনি সেই দোয়া কবুল করবেন না।"-(তিরমিযীঃ হাদীস নং- ২১১৫: হাসান)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে পাপ ও অনিষ্টকারীতা এভাবে অনুপ্রবেশ করে- এক ব্যক্তি যখন অপর ব্যক্তির সাথে মিলিত হত তখন তাকে বলত, হে অমুক! আল্লাহকে ভয় কর, যা করছ তা পরিত্যাগ কর কেননা এ কাজ তোমার জন্য বৈধ নয়। পরদিনও সে তার সাথে মিলিত হয়ে

তাকে পুর্বাবস্থায় দেখতে পেত কিন্তু সে আর তাকে নিষেধ করত না। এভাবে সেও তার পানাহার ও ওঠা-বসায় শরীক হয়ে পড়ে। যখন তারা এমন অবস্থায় পৌঁছে গেল, তখন আল্লাহ তাদের একের অন্তরের (কালিমা) দ্বারা অপরের অন্তরকে অন্ধকার করে দিলেন। মহানবী (সাঃ) বলেন: কখনও নয়! আল্লাহর শপথ! তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ করতে থাক এবং অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে (লোকদেরকে) বিরত রাখ, জালিমের হাত শক্ত করে ধর এবং তাকে টেনে তুলে সত্য-ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের অন্তরকে মিলিয়ে দিবেন। অতঃপর বনি ইসরাঈলদের মত তোমাদেরকেও অভিশপ্ত করবেন। -(আবু দাউদ: সহীহ)

হযরত নুমান ইবনে বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহর বিধানকে যারা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আর যারা অবহেলা করে তাদের দৃষ্টান্ত হল সমুদ্রগামী একটি জাহাজের আরোহীদের মত, যারা লটারীর মাধ্যমে এর দুই তলায় আসন নির্ধারণ করল। একদল উপরে আর একদল নীচের তলায়। নীচের তলার লোকেরা উপরের তলায় উঠত পানি সংগ্রহ করতে। ফলে উপরের লোকদের ওখানে পানি পড়ত। উপর তলার লোকেরা বলল, তোমরা আমাদের এখানে পানি ফেলে আমাদের কষ্ট দিচ্ছ। সুতরাং আমরা তোমাদেরকে উপরে উঠতে দিব না। নীচের তলার লোকেরা বলল, তাহলে আমরা জাহাজের তলা ফুটো করে পানি সংগ্রহ করব। এই অবস্থায় যদি উপরের তলার লোকেরা নীচের তলার লোকদের হাত ঝাপটে ধরে ছিদ্র করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে পারে তবে সকলেই বেঁচে যাবে। কিন্তু তারা যদি এদেরকে এ কাজ করতে ছেড়ে দেয় তবে সকলেই ডুবে মরবে। (সহীহ বুখারী ও তিরমিযী-২১১৯ : হাসান ও সহীহ)

৪) দুনিয়ার মোহ আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ

দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক। কিন্তু মুসলিমরা আজ দুনিয়ার সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, পরিবার এসব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। ফলস্বরূপ দ্বীনের জন্য নিজেদের সময় ও মেধা যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর অবকাশ নেই। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যারা আমরা চেষ্টা-সংগ্রাম করছি না তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হলো, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" – (সূরা তওবা- ৩৮-৩৯)

তিনি আরো বলেন: "হে নবী! আপনি বলে দিন; যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐসব ধন সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ঐ ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দার আশংকা করছ অথবা ঐ গৃহসমূহ যেখানে অতি আনন্দে বসবাস করছ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের চেয়ে এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে যদি (এইসব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় তাহলে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক যে পর্যন্ত আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।" (সূরা তাওবাহঃ আয়াত - ২৪)

হযরত ইবন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ "যখন তোমরা 'ঈনাহ'(সুদ)-এর সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় করবে, বলদের লেজ ধরে থাকবে, চাষাবাদে মগ্ন হয়ে যাবে, দ্বীনের জন্য পরিশ্রম করা এবং ধন-প্রাণ কুরবানী করা ত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন অপমান ও গোলামী চাপিয়ে দেবেন যা তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বীনের দিকে না ফিরে আসবে ততক্ষন পর্যন্ত তোমাদের উপর থেকে দূরীভূত করা হবে না।" - (আবুদাউদ : ৩৪৬২)

৫) মুসলিম উম্মাহর মাঝে পারস্পরিক বিরোধ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্য্যশীলদের সাথে"। (সূরা আল-আনফাল: ৪৬)

আল্লাহ তাআলার নির্দেশ "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরো বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (আলে ইমরান-১০৩) যেখানে আমাদের মহান রব দলাদলি ও পরস্পরের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হতে নিষেধ করছেন সেই জায়গায় আজকে আমরা নামাজে হাত বাঁধা, জোরে না আস্তে আমিন, তাশাহুদে আঙ্গুল নাড়ানো ইত্যাদি মুস্তাহাব বিষয়গুলোকে নিয়ে একে অপরের সঙ্গে কাদা ছোড়াছুড়ি ও বিরোধীতায় ব্যস্ত। কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য থাকবেই, তবে মতপার্থক্য বিরোধ ও পারস্পরিক বিবাদের রূপ নিচ্ছে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আজকে যখন বাতিল শক্তি মুসলিমদের দুটো হাত কাটার পরিকল্পনা করছে বরং হাত কাটছে তখন আমরা নামাজে হাত কোথায় বাঁধতে হবে এই নিয়ে নিজেরা পরস্পর লড়াই করছি। আমি বলছি না যে, নামাজে হাত বাঁধা একটি গুরুত্বহীন বিষয় তবে আমাদের

বুঝতে হবে কোনটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম যে বিষয়ের প্রতি যতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেছে আমাদেরকে ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত। ইখতেলাফি বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকার তিক্ত অভিজ্ঞতা মুসলিম উম্মাহর রয়েছে। ইরাকের আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে যখন হালাকু খান আক্রমণ করেছিল, তখন বাগদাদের আলেম পণ্ডিতরা ব্যস্ত ছিলেন মেসওয়াক ডান মাড়ির উপরের অংশ থেকে শুরু হওয়া উচিত, নাকি ডান মাড়ির নিচের অংশ থেকে শুরু হওয়া উচিত এই অপ্রয়োজনীয় বাহাস নিয়ে।

৬) প্রকৃত দ্বীনী ইলম ও আমলের অভাব

আল্লাহ তা'আলা রাসূলের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ"। কিন্তু মুসলিমদের এক বিরাট অংশ দ্বীনের জ্ঞান থেকে সহস্র মাইল দূরে অবস্থান করছে। স্কুল-কলেজ ইউনিভারসিটি থেকে বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করলেও দ্বীনের নূন্যতম জ্ঞান তার মধ্যে নেই। ফলস্বরূপ সত্য-মিথ্যা, হালাল হারাম, শত্রু মিত্র, নৈতিকতা এগুলি সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ। ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে থাকে না কোন নৈতিকতা, সে গ্রহণ করে নেয় অন্যের আদর্শকে। অপরপক্ষে যারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে তাদের মধ্যে অনেকে জ্ঞানের মাধ্যমে পান্ডিত্য প্রদর্শন করে এবং দ্বীনের জ্ঞানকে কাজে লাগায় পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। তাইতো তারা ইসলামের সেরূপ ব্যাখ্যা করে যেরূপ ব্যাখ্যা করলে বাতিল শাসকগোষ্ঠী বাড়ি করে ফুলের মালা ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে যাবে। এমনকি তারা বাতিল শাসকগোষ্ঠীর চাটুকারিতা করতেও পিছপা হয় না। ইতিহাসে ইহুদী আলেমরা অর্থের জন্য তওরাতের ব্যাখ্যা নিজের মতো করে করতো এবং তারা কিতাবের কিছু অংশ গোপন রাখত আর কিছু অংশ প্রকাশ করতো। আল্লাহ তাআলা বলেন "আমি যা অবতীর্ণ করেছি (কুরআন) তাতে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো, তোমাদের কাছে যা আছে (তওরাত) এটি তারই সমর্থক। আর তোমরাই এর প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতকে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করো না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করবে।" (সূরা বাকারা- ৪১)। ইহুদি আলেমদের মত আজকে আমাদের সমাজেও কিছু আলেম অর্থ সম্পদের জন্য কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করছে। সুতরাং, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন আমল করার জন্য নয় বরং অর্থ সম্পদ উপার্জন করার জন্য করা হচ্ছে যা উম্মাহর উপর বিপর্যয় আপতিত হওয়াকে ত্বরান্বিত করছে।

৭) সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক অবক্ষয়ঃ-

বিশ্বব্যাপী আজ শুধু অমুসলিমরাই যে সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত শিখরে অবস্থান করছে তা নয় বরং মুসলিমরাও নিজেদের আদর্শকে ছেড়ে দিয়ে পদে পদে তাদেরকে অনুসরণ করছে এবং নৈতিক অবক্ষয়ের অতল গহ্বরে দিনের পর দিন তলিয়ে যাচ্ছে। এমন কিছু নৈতিকতা বিবর্জিত বিষয় রয়েছে যেগুলো কোনো জাতির মধ্যে বিরাজমান থাকলে সেই জাতি ইলাহী গজবের দার প্রান্তে অবস্থান করে।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: হে মুহাজির দল! পাঁচটি কর্ম এমন রয়েছে যাতে তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়লে শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করবে। আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই তোমরা যেন তা প্রত্যক্ষ না করো। ১) যখনই কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক হবে তখন সে জাতির মাঝে প্লেগ ও এমন রোগ ব্যাপক হবে, যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না। ২) যে জাতি মাপে কম দিবে সে জাতি দুর্ভিক্ষ, খাদ্য সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে। ৩) যে জাতি যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে সে জাতির জন্য বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হবে। যদি অন্যান্য প্রাণীকুল না থাকত তাহলে তাদের জন্য আদৌ বৃষ্টি হত না। ৪) যে জাতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি ভংগ করবে সে জাতির উপরে তাদের বিজাতীয় শত্রুদলকে ক্ষমতাসীন করে দেওয়া হবে, যারা তাদের বহু ধন-সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করবে। ৫) যে জাতির শাসকগোষ্ঠী আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী দেশ শাসন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের মাঝে সন্ত্রাস/গৃহযুদ্ধ স্থায়ী রাখবেন। -(বায়হাকী ও ইবনে মাজাহ)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন কোন এলাকায় যিনা ও সুদ ব্যাপক হয় তখন ঐ এলাকার লোকেরা নিজেদের উপর আল্লাহর শাস্তিকে হালাল করে দেয়।

বিপর্যয় থেকে উত্তরণের উপায়:-

মুসলিম উম্মাহ যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন তার কারণ আলোচনা করতে গিয়ে উত্তরনের অনেক উপায় আলোচিত হয়েছে যেগুলিকে সংক্ষেপে এইভাবে বলা যেতে পারে।

১) দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং পরিপূর্ণ ইসলাম পালনের চেষ্টা।

২) আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকারের কাজ করা।

৩) দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা।

৪) ফুরুঈ ও ইখতিলাফি বিষয়গুলি নিয়ে লড়াই না করে কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে সঠিকভাবে দ্বীন বোঝার এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন । আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

নববর্ষ

হাবিবুল্লাহ

আল্লাহপাক মানবজাতিকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে, মাঝ সমুদ্রে দাঁড়-পাল কম্পাসহীন নৌকার মতো ছেড়ে দেননি। মানবজাতির সঠিক পথে চলার জন্য, পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে নবী ও রসূলগণকে পাঠিয়েছেন। তারপরেও মানুষ অভ্যাসগতভাবেই তার রবকে ভুলেছে, তার স্রষ্টাকে ভুলেছে। নিজের মতো করে বানিয়েছে পশু-পাখি গাছপালাকে রব। অতিরিক্ত ভোগ-বিলাস, অবৈধ চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য বানিয়েছে নিজের মতো করে 'সংস্কৃতি'। আর তখনই এই বিপথগামী জাতিকে সুপথগামী করার জন্য আল্লাহপাক পাঠিয়েছেন নবী ও রাসূলগণকে। আর এই মিশনের শেষ রসূল হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন, মানবতার দূত, আল্লাহর রহমত হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্লাহ তার প্রিয় হাবিবের মাধ্যমে মানব জাতিকে দিয়েছেন একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। আল্লাহ বলছেন, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নি'আমত সম্পূর্ণ করলাম; আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" (সূরা আল-মায়েদা : ৩) রাসূল সাঃ এর প্রিয় সাহাবা (রাঃ), তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনগণ এই দ্বীনকে ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। মানুষ এই দ্বীনকে গ্রহণ করে হয়েছে ধন্য। আর যারা এই দ্বীনকে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে বলেছেন, "তোমরাই উত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান!" আর আল্লাহর এই প্রিয় বান্দারাই পৃথিবীকে করেছে শাসন। মানব জাতি পৃথিবীতে পেয়েছে মানবতা, ইনসাফ, মুক্তির স্বাদ। তবে পরিতাপের বিষয়, কালক্রমে এই জাতি তার দ্বীনকে ভুলেছে, মেতেছে ভোগ বিলাসে। ফলস্বরূপ তারা শাসক থেকে পরিণত হয়েছে শোষিত জাতিতে। এই মুসলিম জাতি আজ শুধু রাজনৈতিকভাবেই পরাজিত নয়, তারা বৌদ্ধিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত ক্ষেত্রেই পরাজিত। বিজাতির গোলামি করা, তাদের অনুকরণ করার মধ্যে জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ, সফলতা খোঁজে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সমস্ত ক্ষেত্রেই আজ তারা বিজাতির অনুকরণ করতে ব্যস্ত। তার চলাফেরা, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসব-অনুষ্ঠানাদি, খেলাধুলা, আনন্দ উৎসব সবকিছুই আজ বিজাতির অনুকরণ। তাদের আচার-আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, ইসলাম এমন একটি দ্বীন, যার নিজস্ব কোনো সংস্কৃতি বলে কিছু নেই! অন্যদের কাছে ধার করে, ভিক্ষা করে এদের আনন্দ উৎসব করতে হয়। বিশেষ করে মুসলিম যুবসমাজের অবস্থা বড়ই হতাশাজনক। আজ তারা এইরকমই এক উৎসবের প্রস্তুতি নিচ্ছে, নিজেদের জীবনকে "সুখ স্বাচ্ছন্দময়" করে কাটানোর জন্য "ইংরেজি নববর্ষ" বরণের উৎসব(?)! নাচ গান, হই-হুল্লোড়, পিকনিক, দারু মদ, আতশবাজি নিয়ে উদযাপন করবে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর নাইট। যেন পরবর্তী একটা বছর এইরকমই আনন্দমুখর হয়ে কাটে তার জীবন! কি অদ্ভুত! এইভাবে কোনো বছরের প্রথম দিন হই-হুল্লোড়, নাচ গান করে বরণ করলে যদি পরবর্তী বছর সুখের হতো, তাহলে আল্লাহর রসুল সাঃ কি এইভাবে নতুন বছর উদযাপনের বিধান দিতেন না? আল্লাহর রাসূল সাঃ উদযাপন করতেন না? তার সাহাবারা করতেন না? কিন্তু এই ধরনের কোন হাদিস কি রয়েছে? বা কুরআনে? এইভাবে একবিন্দুও দুঃখ কষ্ট পৃথিবী থেকে কারো দূর হয়েছে?

যারা এরকম ধারণা রাখবে যে, এই একটি দিন ভালোভাবে আনন্দ উৎসব করলে পরবর্তী বছর সুখে কাটবে, এটা এক ধরনের শিরক ছাড়া কিছুই নয়। তাছাড়া এই দিনটিতে বিভিন্ন রকম নাচ-গান এর মত হারাম কাজে লিপ্ত থাকে, অর্থ অপচয় করে। অপচয়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহপাক কুরআনে বলছেন, اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا "নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ"। (কুরআন-১৭ঃ২৭) তাছাড়া ইসলামে ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতর, এই দুইটি উৎসব ছাড়া আর অন্য কোন উৎসবের বিধানও নেই।

যাইহোক, আমাদের যুবসমাজ যে ইংরেজি নববর্ষ উদযাপনের জন্য এত উদগ্রীব হয়ে রয়েছে, সেই ইংরেজি নববর্ষ আসলে কী, আমাদের জানা প্রয়োজন। আমরা যে ইংরেজি সাল তারিখ ব্যবহার করি, তা মোটেও ইংরেজি নয়; বরং তা খ্রিস্টধর্মীয়। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ১৬০০ বছর পর, ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে ২৪শে ফেব্রুয়ারি পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী তৎকালে প্রচলিত প্রাচীন রোমান জুলিয়ান ক্যালেন্ডার (Julian calendar) সংশোধন করে

যীশুখ্রীষ্টের জন্মকে সাল গণনার শুরু ধরে, এই পঞ্জিকা সাল-তারিখ প্রচলন করেন, যা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার (Gregorian calendar) বা খ্রিস্টিয়ান ক্যালেন্ডার (Christian calendar) নামে পরিচিত। যিশুখ্রীষ্টকে প্রভু ও উপাস্য হিসেবে বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই বৎসরকে বলা হয় আন্নো ডোমিনি (Anno Domini) বা AD. এর অর্থ "Anno Domini nostri Jesu Christi" বা "in the year of our Lord Jesus Christ" বা "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বৎসর"। আর এই জন্যই, আমরা যাকে ইংরেজি সাল বলি, তার পাশে লিখা থাকে AD. ১৫৮২ তে কিছু মুষ্টিমেয় রোমান ক্যাথলিক দেশ এই গ্রেগোরিয় বর্ষপঞ্জী বা ক্যালেন্ডার গ্রহণ করে এবং পরবর্তীকালে ক্রমশ অন্যান্য খ্রিস্টান দেশসমূহেও এটি গৃহীত হয়। আর ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করে ১৭৫২ সালের সেপ্টেম্বরে। তখন তারা তাদের ক্যালেন্ডার থেকে ১১ দিন বাদ দেয়। তাই ১৭৫২ সালের ক্যালেন্ডারে ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর এই ১১ টি দিন পাওয়া যায় না।

এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার, আমরা যে ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন করি, সেটি মোটেও ইংরেজি নববর্ষ নয়। তাহলে ভাবুন, এই জাতি আজ কত অজ্ঞ, নববর্ষের নামে একটি খ্রিস্টান উৎসবকে তারা আনন্দের সাথে উদযাপন করে চলেছে? আল্লাহ কুরআনে বলছেন, وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ "দ্বীন ইসলাম ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন দ্বীন অনুসরণ করতে চায়, তার সে দ্বীন কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" (আলে ইমরান- ৮৫)

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) অন্য জাতিকে অনুসরণ করার ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করে বলেছেন, عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪০৩১ হাদিসের মান: হাসান সহিহ।)

তাহলে এটা পরিষ্কার, এই "খ্রীষ্টান নববর্ষ" পালন করা সম্পূর্ণ হারাম এবং শির্ক। হাসি মজার ছলে নববর্ষ পালন করতে গিয়ে, নিজেদেরকে খ্রিস্টানদের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলছি। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন এবং এই অপসংস্কৃতি থেকে রক্ষা করুন।

আরো দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ মুসলিম সমাজ "খ্রিস্টান নববর্ষ" নিয়ে আনন্দ উৎসবে মেতে রয়েছে, অথচ তারা ইসলামিক সাল-তারিখের খবরটি কেউ রাখেই না! কি সেই ইসলামিক সাল-তারিখ? আসুন, সেটিও একটু জেনে নিই। "মুহররম মাস" হিজরী ক্যালেন্ডারে প্রথম মাস। কি এই "হিজরী" ক্যালেন্ডার? একটু জেনে নিই। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর "খুতবাতুল ইসলাম" গ্রন্থের ৩১ নম্বর পৃষ্ঠায় তাবারী, আত-তারীখ ২/৩-৪; ইবনুল জাওযী, আল-মনতাযিম ২/১এর বরাত দিয়ে লিখেছেন, - "খালিফা উমরের (রাঃ) খিলাফতের তৃতীয় বা চতুর্থ বৎসর আবু মুসা আশআরী (রাঃ) তাঁকে পত্র লিখে জানান যে, আপনার সরকারি ফরমানগুলিতে সন-তারিখ না থাকায় প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়; এজন্য একটি বর্ষপঞ্জি ব্যবহার প্রয়োজন। খলিফা উমার (রাঃ) সাহাবীগণকে একত্রিত করে পরামর্শ চান। কেউ কেউ রোম বা পারস্যের পঞ্জিকা ব্যবহার করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু অন্যরা তা অপছন্দ করেন এবং মুসলিমদের জন্য নিজস্ব পঞ্জিকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এ বিষয়ে কেউ কেউ পরামর্শ দেন যে, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর মিলাদ বা জন্ম থেকে সাল গণনা শুরু করা হোক। কেউ কেউ তাঁর নবুওয়াত থেকে, কেউ কেউ তাঁর হিজরত থেকে এবং কেউ কেউ তাঁর ওফাত থেকে বর্ষ গণনার পরামর্শ দেন। হযরত আলী (রাঃ) হিজরত থেকে সাল গণনার পক্ষে জোরালো পরামর্শ দেন। খলিফা উমর (রাঃ) এ মত সমর্থন করে বলেন যে, হিজরতই হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যের সূচনা করে; এজন্য আমাদের হিজরত থেকেই সাল গণনা শুরু করা উচিত। অবশেষে সাহাবীগণ হিজরত থেকে সাল গণনার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।"

কোন মাস থেকে বর্ষ গণনা শুরু করতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়। কেউ কেউ রবিউল আউয়াল মাসকে বছরের প্রথম মাস হিসাবে গ্রহণ করার পরামর্শ দেন; কারণ রসূলুল্লাহ সাঃ এ মাসেই হিজরত করে মদিনায় আগমন করেন। ১২ই রবিউল আউয়াল তিনি মদিনায় পৌঁছান। কেউ কেউ রমাদ্বান থেকে বর্ষ শুরুর পরামর্শ দেন; কারণ রমাদ্বান মাসে আল্লাহ কুরআন নাজিল করেছেন। সর্বশেষ তারা মুহররম মাস থেকে বর্ষ শুরুর বিষয়ে একমত হন; কারণ এ মাসটি ৪টি 'হারাম' বা সম্মানিত মাসের একটি। এছাড়া ইসলামের সর্বশেষ রুকুন হজ্জ পালন করে মুসলিমগণ এ মাসেই দেশে ফিরেন। হজ্জ পালনকে বৎসরের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্ম ধরে মুহররম মাসকে নতুন বৎসরের শুরু হলে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এভাবে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর ইন্তেকালের প্রায় ৬ বৎসর পরে ১৬ বা ১৭ হিজরী সাল থেকে সাহাবীগণের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে হিজরী সাল গণনা শুরু হয়। যদিও হিজরত রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়, তবুও দুমাস পিছিয়ে সে বৎসরের মুহাররম থেকে বর্ষ গণনা শুরু হয়। শুধু তাই নয়, এই মুহররম মাস সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন এটি আল্লাহর মাস। তিনি বলেছেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ

☞☞☞পরবর্তী অংশ ১৮ নং পাতায়

প্রমাণ এবং বিশ্বাসের মধ্যেকার পার্থক্য

মাহফুয আল-আমিন

প্রমাণ আর বিশ্বাস, দুটি দুই মেরুর ভিন্ন দুটি বিষয়। ২+২ =৪, এটা প্রমাণিত ফ্যাক্ট, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে এটাও প্রমাণিত, চন্দ্র ও সূর্য পর্যায়ক্রমে দিন ও রাত আবর্তন ঘটায়, এই সবই প্রমাণিত। এখন প্রশ্ন হলো, যেটা অলরেডি প্রমাণিত, সেটা বিশ্বাস করা আর না করার কিছু আছে কি? যেটা এমনিই প্রমাণিত, সেটা অবিশ্বাস করার মত কোন অপশন ই আসলে বাকি থাকে না। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বিশ্বাস একটি যৌক্তিক বিশ্বাস, স্বভাবজাত, জন্মগত বিশ্বাস। মানুষ তার চারপাশে তাকালেই স্রষ্টার অস্তিত্বের নিদর্শন এমনিতেই চোখে পড়ে, এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত ৯৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষের মহাবিশ্ব স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি এবং এতো নিখুঁতভাবে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ যে সম্ভব নয়, তা যে কোন যৌক্তিক মস্তিষ্ক সহজেই অনুধাবণ করতে জানে।

এখানে প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানের মানদন্ড টেনে আনা মানে বিজ্ঞানকেই নিজের মনের অজান্তে স্রষ্টা হিসেবে মেনে নেয়া, যদিও একজন নাস্তিক না বুঝে অথবা নিজে পরীক্ষা না করে, বিজ্ঞান যা বলে তাই মেনে নেয়, অথচ এই বিজ্ঞানই প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল।

মানুষকে যেহেতু এই পৃথিবীতে পরীক্ষা করা হচ্ছে, সেহেতু এখানে অপশন রাখাই হয়েছে এমনভাবে, যে বিশ্বাস করার সে যেমন নিদর্শন খুঁজে পাবে, যে অবিশ্বাস করার সেও কোন না কোন অজুহাত খুঁজে পাবে। ব্যাপারটা এমন না যে, আল্লাহ তাআলা একদিন নেমে এসে সবাইকে দেখিয়ে বলবেন, আমি আল্লাহ। তারপরেই সবাই বিশ্বাসী হয়ে ধর্ম কর্ম করা শুরু করে দেবে! মানুষের বিশ্বাস অবিশ্বাস তার ইন্দ্রিয়ের, বা বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্তের চেয়ে বরং মানসিক সিদ্ধান্ত বা যৌক্তিক সিদ্ধান্তের উপর বেশি নির্ভর করে।

যে অবিশ্বাস করার নিয়ত করেই ফেলেছে, সে কোন না কোন অজুহাত খুঁজে বের করবেই, কেননা যদি সে তা না করে, তবে তার নিজেকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে হবে, যা সে মন থেকে চায়না। আল্লাহ তো বলেছেন ই- "যদি আমি তাদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণও করতে থাকে, তবুও ওরা একথাই বলবে যে, নিশ্চিত আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে অথবা আমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।" (সূরা হিজর- ১৪-১৫)

মানুষ কেন নাস্তিক সাজতে চায় তার সহজ একটা কারণ বলছি- মানুষ যখন নিজের মন মত, খেয়াল খুশি মত, প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে দেখে ধর্ম সেইখানে মূল বাধা, ধর্ম সেখানে সেইগুলোকে ডিসিপ্লিন এর মধ্যে আনতে বলে সেই অনুযায়ী চলতে বলে, সেই জন্য তার বিরুদ্ধে অন্তরকে তৈরি করতে আর নিজের খেয়াল খুশি মত চলতে বিপরীত এক শক্তিশালী অবস্থানের দরকার হয়, আর তখনই মানুষ নাস্তিকতাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের আদর্শ হিসেবে বেছে নেয়ার চেষ্টা করে। কেননা পাপ করতে গিয়ে তার মনে যে আঘাত, কষ্ট অনুভূত হয়, তার প্রতি অন্তরকে সহনীয় করে তুলতে আর পাপ চালিয়ে যেতে অন্তরকে পাপের কষ্ট বিরোধী খাবার খাওয়াতে হয়, আর সেখান থেকেই নাস্তিকতার উৎপত্তি ঘটে। কোন মানুষের পক্ষেই নাস্তিক হওয়া আসলে সম্ভব নয়। কেননা স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস মানুষের স্বভাবজাত এক বৈশিষ্ট্য। সাইন্স নিজেও ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে পারেনা- যেটাকে বলা হয় "গড মলিকিউল"।

স্রষ্টার অস্তিত্ব সত্যিকার অর্থে অন্তরে ধারণ করতে তাকে নিজের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান, স্ট্যান্ডার্ড আর অস্তিত্বের প্রয়োজনেই তার দেয়া নিয়ম কানুন পালনের মধ্য দিয়ে খুঁজতে হয়, অনুধাবন করতে হয়। তথ্য প্রমাণ, নিজস্ব যুক্তির মারপ্যাঁচে স্রষ্টাকে নিজের মত অস্বীকার করা মানেই নিজের স্বার্থ বাঁচাতে সুবিধাবাদী নাস্তিক সাঁজা!

☞☞☞ ১০ নং পাতায় পর

front of Allah, the more Allah will 'up' your status'। শয়তানের সাথে মানুষের পার্থক্য হল এটাই, শয়তান আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে তার কাছে মাফ চায়নি, বরং নিজের ভুলের উপর অটল থেকেছে, নিজের ইগোকে বিসর্জন দিতে পারেনি; আর আদম নিজের উপর অটল থাকেনি, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। জান্নাতিরাও ভুল করা লোক, জাহান্নামীরাও ভুল করা লোক; পার্থক্য এতটুকুই যে জান্নাতিরা ভুলের উপর ক্ষমাপ্রার্থনাকারী এবং তওবাহকারী। (ইন জেনারেল)। শেষ করবো কুরআণের একটা আয়াত দিয়ে, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।" (কুরআন- ৯৮ঃ৭)

"Indeed, they who have believed and done righteous deeds – those are the best of creatures. "

পিঁপড়ে কি কথা বলতে পারে?

রাজিব হাসান

আচ্ছা পিঁপড়ে কি কথা বলতে পারে? যদি বলি পারে। কুর'আন যেহেতু বলছে পিঁপড়ে কথা বলতে পারে, তাই এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ থাকেনা। "পিঁপড়ে"- এর ব্যাপারে একটা পূর্নাংগ সূরাই আছে কুর'আনুল কারীমে। ২৭তম সূরাটির নাম আন-নামল বা পিপীলিকা। সর্বশক্তিমান আল্লাহ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী দিয়ে উদাহরণ দিতে কুণ্ঠিতবোধ করেন না। আমরা মানুষেরাই জাতিগতভাবে পিছিয়ে পড়েছি, অবাধ্য হয়েছি শিকড়হীন হয়ে পড়েছি। মাছি, মৌমাছি, পিঁপড়ে, গরু এইসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাণীর উদাহরণ দিয়ে আয়াত নাযিল করে সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক মানুষকে হিদায়েতের দিকে ডাকেন রব্বে কারীম। সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।

যা বলছিলাম, পিঁপড়ে কথা বলতে পারে। ঘটনাটা নাবী সুলাইমান (আ:)-এর শাসনামলের। সুলাইমান (আ:) - এর মু'জিযা ছিল এই যে, পশু-পাখি ও জ্বীন তার অধীনস্থ ছিল, তার দাসত্ব করত। সুলাইমান (আ:) তাদের ভাষাও বুঝতে পারতেন। কুর'আন বলছে, "সুলাইমানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল। জ্বিন, মানুষ ও পক্ষিকূলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হল। যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের ঘরে প্রবেশ কর। অন্যথায়, সোলায়মান ও তাঁর বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে।" [আন নামল ঃ ১৭-১৮]

মনে হতে পারে গাল-গল্প বা ঠাকুমার ঝুলি অথবা পৌরাণিক কথা। কিন্তু কুর'আন কোন গাল-গপ্পের ঝুলি নয়। এ সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নাই। পিপীলিকা অবশ্যই কথা বলতে পারে। সম্প্রতি এক গবেষণার মাধ্যমে পিপীলিকার জীবনযাপন ও পদ্ধতি সম্পর্কে এমন সব প্রকৃত ও বাস্তবসম্মত তথ্য উদঘাটিত হয়েছে, যা আগে মানুষ অবগত ছিল না। গবেষণায় বলা হয়েছে, মানুষের জীবনের সাথে যে সকল প্রাণী ও কীট-পতঙ্গের অধিকতর সাদৃশ্য আছে, সেটা হল, পিঁপড়ে। [Bert Hölldobler and Edward O. Wilson, The Ants (Cambridge: Harvard University Press: 1990), 227]

পিঁপড়ে সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য বের হয়েছে যা দিয়ে মানুষের সাথে তার সাদৃশ্যের সত্যতা যাচাই করা যায়:

১) পিঁপড়ে মানুষের মত মৃতদেহ দাফন করে। (সুবহানাল্লাহ)

২) তাদের মধ্যে উন্নতমানের শ্রম বিভক্তি আছে। তাদের মধ্যে রয়েছে পরিচালক, রয়েছে তত্ত্বাবধায়ক আর শ্রমিকশ্রেণী ইত্যাদি।

৩) তারা গল্প করার জন্য কোন কোন সময় এক সাথে আড্ডায় বসে।

৪) নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য তাদের রয়েছে অগ্রিম যোগাযোগ পদ্ধতি। (কন্টাক্ট করে)

৫) দ্রব্য বিনিময়ের জন্য তাদের মধ্যে বাজার বসে।

৬) তারা শীত মৌসুমে দীর্ঘ সময়ের জন্য খাদ্য দ্রব্য গুদামজাত করে। খাদ্য শস্যের মুকুল বের হলে, এবং মুকুলিত অবস্থায় রেখে দিলে যদি শষ্যটি পঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখনই তারা মুকুলটির গোড়া কেটে দেয়। তাদের গুদামজাতকৃত শস্যদানা যদি বৃষ্টির কারণে ভিজে যায়, তখন তারা এটাকে রোদে নিয়ে শুকায় এবং শুকানোর পর পুনরায় ভেতরে নিয়ে আসে। মনে হয় তারা এটা জানে যে, আর্দ্যতার কারণে শষ্যদানায় মুকুল বের হতে পারে। ফলে শষ্য দানাটি পঁচে যেতে পারে।

সুবহানাল্লাহ! ছোট্ট একটা প্রাণী অথচ কি শৃংখলাবদ্ধ আর বুদ্ধিবৃত্তিক তার লাইফ-স্টাইল। একদম মানুষের কাছাকাছি তার কর্মকান্ড, কাজ পরিচালনার পদ্ধতি। সৃষ্টিকূলের এই বৈচিত্রতার কারিগর কে? কে করেছেন এই সুনিপুণ কায়দায় এসব কিছুর সৃষ্টি। তিনি আর কেউ নন। তিনি আমাদের রব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা।

"যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর [নিখুঁত] করেছেন"[আস-সাজদা, আয়াত:৭]

☞☞☞ ১৬ নং পাতায় পর

صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ. রমাযান মাসের সিয়ামের পর 'আল্লাহ্‌র মাস' মুহার্‌রমের সওম সর্বোত্তম। (সহিহ মুসলিম- ২৬৪৬)। তাহলে বোঝা গেল, হিজরী ক্যালেন্ডার বা সাল-তারিখ আরবি নয়, ইসলামিক। অথচ দুর্ভাগ্য, হিজরী সাল-তারিখ সম্পর্কে সাধারণ মুসলিমই শুধু নয়, অনেক দ্বীনদার মুসলিম ও অজ্ঞ, তারা বলতেও পারবেন না, আজ কত হিজরী বা কোন হিজরি মাসের কত তারিখ।

আসুন, আমরা "খ্রিস্টান নববর্ষ" উদযাপনকে শুধু বর্জন নয়, আমরা সেই সন তারিখকে যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করি, এবং ইসলামিক সন তারিখ ব্যবহারের উপর বেশি বেশি গুরুত্ব দিই। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন, আমিন।

অখন্ড ভারতঃ অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান!

আসাদ ইরফান

বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে আলোচিত, সমালোচিত এবং নিন্দিত শব্দগুচ্ছ "অখন্ড ভারত"। সেক্যুলার নামধারী ভারতের কিছু উগ্র কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন এবং ব্যক্তিবর্গের দাবি হচ্ছে ভারতবর্ষকে 'অখন্ড ভারত'-এ পরিণত করা। অখন্ড ভারত গঠনের মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হবে। তাদের এই দাবি নিছক দিবাস্বপ্ন বৈ আর কিছু নয়।- যা নিকট ভবিষ্যতে কেন, সুদূর ভবিষ্যতেও বাস্তবায়িত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অখন্ড ভারতের যেমন কোনো ভবিষ্যত নেই; তেমন, আদৌ কি তার কোন অতীত আছে? নাকি ভবিষ্যতের দিবাস্বপ্নের মত অতীতও কল্পনাপ্রসূত.!? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদেরকে ইতিহাসের অনেকগুলো পাতা উল্টাতে হবে। ব্রিটিশ মোগলদের পিছে ফেলে আরো অনেক অনেক পিছনে ফিরে দেখতে হবে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে কোন সাম্রাজ্যই সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশকে একটি নির্দিষ্ট শাসনের অধীনে আনতে পারেনি। মৌর্য সাম্রাজ্য, মোঘল সাম্রাজ্য, বৃটিশ সাম্রাজ্য– কোন সাম্রাজ্যই সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করতে সক্ষম হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভারতবর্ষ জয়ের অনেক কাছাকাছি গিয়েছিলো চাণক্য নীতি অবলম্বন করে। প্রাচীণ ভারতবর্ষের সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধাণ অমাত্য কৌটিল্য, যিনি চানক্য নামেই পরিচিত।

চাণক্যের সময়কাল আজ থেকে প্রায় ২৩০০ বছর আগে। তৎকালীন সময়ে এই অঞ্চলটি বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য এবং সাম্রাজ্যে বিভক্ত ছিল। চাণক্য বিশ্বাস করতো সমগ্র অঞ্চলটিকে একটি নির্দিষ্ট শাসন, প্রশাসন এবং কর্তৃত্বের অধীনে আনতে হবে। সে তার শিষ্য, মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মাধ্যমে তার স্বপ্নের পথে অনেক দূর এগিয়েও যায়। এরপর চন্দ্রগুপ্তের নাতি অশোক প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষকে পাঁচ দশকের জন্য তার করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়।

অখন্ড ভারতের অভিলাষ পূরণের জন্য সম্রাট অশোক একের পর স্বাধীন অঞ্চলগুলোতে আগ্রাসন চালায়। এমনই একটি আগ্রাসন হচ্ছে কলিঙ্গের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে সম্রাট অশোক প্রায় এক লক্ষ কলিঙ্গ অধিবাসীদের হত্যা করে। কলিঙ্গ যুদ্ধের বিভীষিকা সম্রাট অশোকের অন্তরকে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। সে অখন্ড ভারতের স্বপ্ন এবং জীবনের সকল বিলাসিতা ছেড়ে দিয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তারই প্রচেষ্টায় সারা ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার হয়। কিন্তু তার মৃত্যুর পর খুব দ্রুতই মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে।

চানক্যের একটি শিক্ষা ছিল, উগ্র সাম্প্রদায়িক উচ্চবর্ণ হিন্দু ব্রাহ্মণদের জন্য – "ক্ষমতা অর্জনের লোভ ও অন্য দেশ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা কখনও মন থেকে মুছে ফেলো না। সব সীমান্তবর্তী রাজাকে শত্রু বলে মনে করবে।" আজ, কয়েক হাজার বছর পরে এসে ঠিক সেই মূলনীতি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী ভারত।

ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের পর যদি কোন ধর্ম ব্যাপক প্রসারতা লাভ করে থাকে, তাহলে তা হচ্ছে 'বৌদ্ধ ধর্ম'। হিন্দু ধর্ম বা সনাতন ধর্ম কখনোই ভারতবর্ষে এককভাবে প্রসারতা বা ব্যপকতা লাভ করতে পারেনি। তাই মৌর্য সাম্রাজ্যের অখন্ড ভারতের স্বপ্ন যদি বর্তমান হিন্দুত্ববাদীরা গ্রহণ করতে চায়; তাহলে ভারতবর্ষে হয় "ইসলামী রাজ্য" বা "গৌতম রাজ্য" প্রতিষ্ঠা লাভ করার কথা। কোনোভাবে অখন্ড ভারতে রাম রাজ্যে প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা পাওয়া যায়নি।

মৌর্যদের অনেক পরে ভারতবর্ষকে একত্র করার কাজ হাতে নেয় মোগল সাম্রাজ্য। কিন্তু তারাও ভারতবর্ষকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়নি। কারণ ভারতের অধিকাংশ জনগণ মোগলদেরকে ভিনদেশী বলে মনে করত। তাই তারা তাদের থেকে পৃথক এবং স্বাধীন থাকাটাই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। তাছাড়া মুঘলদের শাসনটা ছিল মূলত উত্তর ভারত ও পাকিস্তান কেন্দ্রিক।

মুসলিম শাসনামলেও বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাতে স্বাধীন সুলতানি শাসন ছিল। গুজরাটে, আসামে আলাদা মুসলিম রাজ্য ছিল।

মুসলমানদের আগমনের আগেও ভারতীয় উপমহাদেশ নানা অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং আলাদা আলাদা রাজা দ্বারা শাসিত হত।

মহারাষ্ট্র স্বাধীন দেশ ছিল তারা বাংলাতে লুটপাট করতে আসত। সেই লুটপাটের কাহিনী নিয়ে একটি ছড়া আছে। "খোকা ঘুমালো পাড়া জোরালো বর্গী এলো দেশে।" এই বর্গী হলো অত্যাচারী হিন্দু ডাকাত সেনরা।

কেরালা-তামিল নাড়ু সবসময়ই স্বাধীন ছিল। তেমনি সর্বদা স্বাধীন রাজ্য ছিল মনিপুর ও মিজোরাম।

আর ব্রিটিশদের কথা বলতে গেলে, ব্রিটিশদের ক্ষেত্রেও

এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ-

এক, বৃটিশ শাসনকালেও গোয়া, পন্ডিচেরির মত কিছু কিছু অঞ্চল পর্তুগিজ, ফরাসিদের অধীনে ছিল।

দুই, সমগ্র ভারতবর্ষের অর্ধেক অংশই কমবেশি স্বায়ত্তশাসিত মহারাজদের অধীনে ছিল। ১৯৪৭ এর দেশ ভাগের আগ পর্যন্ত হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীরসহ অনেক স্বাধীন রাজ্যের উপস্থিতি ছিল। টিপু সুলতান দক্ষিন ভারত শাসন করেছেন।

তিন, আরেকটি বিষয় হলো, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সরাসরি ভারতীয় সাম্রাজ্য না, এটা পরিচালিতও হতো ব্রিটেন থেকে। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকেও এক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা যায় না যে, তারা সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করেছিলো। যদিও অনেক স্বাধীন রাজ্য তাদের ব্রিটিশ আগ্রাসন থেকে নিরাপত্তার জন্য ব্রিটিশ রাজের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পাশাপাশি তারা ব্রিটিশ রাজকে বাৎসরিক খাজনা আদায় করতো। তারপরও এমন অনেক স্বাধীন রাজ্য ছিল যারা আকার আয়তনে ছোট হলেও ভৌগলিক, সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকার উপযোগী ছিল। যেমনঃ হায়দরাবাদ, জুনাগড়, জম্মু ও কাশ্মীর, যোধপুর, জয়পুর, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বরোদা, ত্রিবাঙ্কুর ও মহীশূর।

তবে ব্রিটিশদের ক্ষমতা এবং প্রভাবের দিক দিয়ে বলতে গেলে তারা ছিলো পূর্বের সকল সাম্রাজ্যের চাইতে বেশি শক্তিশালী।

অখন্ড ভারতের স্লোগান হচ্ছে মূলত প্রতিবেশী ছোট ছোট দেশগুলোকে গ্রাস করার স্লোগান। আর ভারতের যেসব অঞ্চল বা প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হতে চায় এবং স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র গঠন করতে চায়, তাদেরকে ধরে রাখার একটা কৌশল। ঐতিহাসিকভাবে হাজার বছরের ইতিহাসে অখন্ড ভারত বলে কিছু নেই। ব্রিটিশদের অধীনস্ত ইন্ডিয়ার কথা বাদ দিলে অখন্ড ভারতের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতেও অখন্ড ভারত বলে কিছু হবে না। ইনশাআল্লাহ।

"অখন্ড ভারত" শব্দগুচ্ছটি আসলে বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের একটি ধারণা ও বিশ্বাস। তাদের বিশ্বাস অনুসারে, বর্তমান ভারতের দুই পাশে অবস্থিত দুই দেশ- পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ হচ্ছে ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐতিহাসিক এবং কৃষ্টিগত দিক দিয়ে ভারতের সাথে মিল থাকায় এই সকল দেশকে ভারতের সাথে যোগ দিতে হবে। অখন্ড ভারতের ধারণায় বিশ্বাসীদের যুক্তি হল এসকল দেশ একসময় হিন্দু ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সুতরাং এই সকল অঞ্চল গুলোকে ভারতের সাথে যোগ দিতে হবে এবং এখানকার বাসিন্দাদের সনাতন ধর্মে ফেরত যেতে হবে।

এই অন্ধ-বিশ্বাসকে পুঁজি করেই অখন্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা কট্টর হিন্দুবাদী সংগঠনগুলো মুসলমানদের উপর একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তবুও মুসলমানরাও দমে যাওয়ার পাত্র নয়। মুসলিমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করে, তারা কখনোই ব্রাহ্মণ্যবাদের দাসত্ব মেনে নিবে না।

"শোষণের জন্যই শাসন"– এই সনাতন মূলনীতির মূলাধার ব্রাহ্মণ্যবাদ। ব্রাহ্মণ্যবাদের মতবাদ হচ্ছে "শোষণকে প্রচ্ছন্ন করতে হলে শাসনকে একটা আদর্শের নামে উপস্থাপন করতে হয়।"

এই শোষণের আদর্শের নামই ব্রাহ্মণ্যধর্ম। তাই ব্রাহ্মণ্যধর্ম কোন ধর্ম নয়, ব্রাহ্মণ্যধর্ম হল আসলে একটি অপরাধের নাম, মানুষকে শোষণের হাতিয়ারের নাম। মানুষে মানুষে বিভাজনের নাম। জাতপ্রথা বর্ণপ্রথা তৈরী করে মানুষকে শোষণের নাম। ব্রাহ্মণ্যবাদ উচ্চ ভোগ বিলাসী জীবন যাপন করার নাম।

প্রশ্ন হলো যারা নিজের ধর্মের মানুষদেরকে জাতপ্রথা তৈরী করে শোষণ নির্যাতন অত্যাচার করে, তারা কিভাবে মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ এবং জৈন ধর্মের মানুষকে আপন মনে করে বুকে জড়িয়ে নিবে?

বর্তমান সময়ে ভারত বরাবরের মতোই অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠিত করতে ষড়যন্ত্র করেই চলছে। মৌর্য সম্রাট অশোক-পূর্ব ভারত কায়েম তাদের লক্ষ্য। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি), রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস), বজরং, শিব সেনা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) মতো মূলস্রোতের ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলো ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সমন্বয়ে একটি অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের দাবি উত্থাপন করছে। অবিভক্ত ভারতের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে অখণ্ড ভারতের অংশ হিসাবে দেখানো হচ্ছে।

নব্বই দশকের শেষ প্রান্তে বিজেপি সরকারের আমলে হিন্দুসংঘ ২০ হাজার স্কুলে ভূগোল বইয়ে ভারতের মানচিত্রে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তিব্বত, মিয়ানমার, নেপাল ও ভুটানকে অখণ্ড ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দেখানো হয় এবং ভারত মহাসাগরকে হিন্দু মহাসাগর, আরব সাগরকে সিন্ধু সাগর এবং বঙ্গোপসাগরকে গঙ্গা সাগর হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়।

শুধু তাই নয়, আফগানিস্তান, লাওস, থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়াকেও অখণ্ড ভারতের অংশ হিসাবে কল্পনা করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী হিন্দুদের সংগঠিত করে এ লক্ষ্যে পৌঁছার স্বপ্ন লালন করা হচ্ছে। খণ্ড বিখণ্ড ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করা হচ্ছে কট্টরপন্থী হিন্দু মহাসভার ঘোষিত নীতি। এ ব্যাপারে অর্পণা পাণ্ডে এক্সপ্লেইনিং পাকিস্তান ফরেন পলিসি শিরোনামে গ্রন্থের ৫৬ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছে, "The Hindu Maha Sabha had declared: India is one and indivisible and there can never be

peace unless and until the separated parts are brought back into the Indian Union and made integral parts thereof."

অর্থাৎ হিন্দু মহাসভা ঘোষণা করেছে: ভারত অভিন্ন ও অবিভাজ্য। বিচ্ছিন্ন অংশগুলো যতদিন ভারত ইউনিয়নে ফিরিয়ে এনে সেগুলোকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করা না হবে, ততদিন শান্তি আসবে না।

অখণ্ড ভারত কায়েমের দূরভিসন্ধি থেকে হিন্দুত্ববাদীরা ১৯৮৪ সালে শিখদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক ত্রাস; ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (প্রতিচিন্তা:১০৮) এবং ২০০৬ সালে গুজরাটে হাজার হাজার মুসলিম হত্যার মত ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে।

অখন্ড ভারত গঠন প্রক্রিয়া দুইটি আদর্শের উপর ভিত্তি করে এগিয়ে চলছে।

এক, সাঙ্গাথান (হিন্দু ঐক্য)। অর্থাৎ, বাংলাদেশ-পাকিস্তানে ছড়িয়ে থাকা হিন্দুদেরকে একত্রিত করা বা তাদের ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা করা। বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয় এবং আমলা-তন্ত্রের উচ্চ পর্যায়ে হিন্দুদের অবস্থান অখন্ড ভারত বিনির্মানে এই আদর্শের প্রয়োগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এবং দুই, শুদ্ধি (বিশুদ্ধিকরণ)। অর্থাৎ ক্ষমতা এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে হিন্দু ধর্ম ব্যতীত বাকি সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে সনাতন ধর্ম অবলম্বন করতে বাধ্য করা। সারা ভারতে মুসলিমদের উপর কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণ মূলত এই আদর্শকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে। সামান্য গরুর গোশত খাওয়ার অপরাধে পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে মুসলমানদেরকে,- কারণ সনাতন ধর্মে গরুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। অথবা জয় শ্রীরাম না বলার অপরাধে নির্যাতন-নিপীড়ন করা হচ্ছে নিরীহ মুসলিমদের।

'অখন্ড ভারত' ধারণা থেকেই একে একে কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, সিকিম এবং নেপালের মাওবাদ, শ্রীলংকার তামিল টাইগারদের বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করা হয়েছে। সর্বোপরি বাংলাদেশের ১৯৭১ এর যুদ্ধ এই অখন্ড ভারত অভিলাষের দূরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনার ফল এবং তার পর থেকে বাংলাদেশে অযাচিত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ইন্ডিয়ার অতি খবরদারিতা তার স্বরূপ উন্মোচন করছে সবার সামনে। বছর কয়েক আগে নেপালের তরাই অঞ্চলের গণভোট এবং এর পরবর্তী জ্বালানী অবরোধও এই অভিলাষের বাইরে নয়।

বর্তমানে চীন এবং ভারতের পরস্পরবিরোধী অবস্থান এবং তালিবান মুজাহিদদের পুনরায় আগফগানিস্থানের ক্ষমতা দখল অখণ্ড ভারতের দাবীদারদের চাপে ফেলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের উচিত তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে যতটা সম্ভব সুসম্পর্ক বজায় রাখা। কিন্তু তা না করে মোদি প্রশাসন মুসলমানদের উপর অত্যাচার নির্যাতন বৃদ্ধি করেছে। ভারত সরকারের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছে। কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো মুসলিমদের উপর একের পর এক আক্রমণ জারি রেখেছে, যা সেক্যুলার নামধারী ভারতের ভাবমূর্তিকে ধূলিসাৎ করছে। পাশাপাশি সারা বিশ্বের বিশেষ করে মুসলিমদের অসন্তুষ্টিকে বৃদ্ধি করছে।

অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ভারতীয় মুসলিমদের উপর। বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং গুজরাটের গণহত্যা বাদ দিলেও ভারতীয় কট্টর হিন্দুত্ববাদী সরকার মুসলিমদের দমনের জন্য তাদেরই প্রণিত "গণতান্ত্রিক সংবিধান" বিবর্জিত পথ অবলম্বন করছে। যেমন, কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করা হয়েছে। আসাম এবং পরবর্তীতে সারা ভারতে এনআরসি আইনের আওতায় মুসলিমদের দেশ ছাড়া করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। মুসলিমদেরকে তাদের ভূমি, তাদের আবাসস্থল থেকে বের করে দেওয়ার জন্য একের পর এক ভূমি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই হিন্দুত্ববাদী ভারতের "অখন্ড ভারত" নীতির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ ভারতের অভ্যন্তরীণ মুসলিমদের পক্ষ থেকে আসাটা সময়ের দাবি। তারা যদি একবার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন, তাহলে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলো থেকে মুজাহিদ্বীনরা তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারেন।

মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার পাশাপাশি চলমান ঘটনাপ্রবাহ থেকেও শিক্ষা নিতে হবে। গেরুয়া শিবিরের দাসত্ব মেনে নেওয়া বা তাদের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা সমান অর্থহীন। সময় এসেছে বিশুদ্ধ তাওহীদের শিক্ষা আত্মস্থ করার। ইসলামকে ঠিক সেভাবেই বুঝে পালন করার, যেভাবে বুঝেছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম- কুরআনের প্রজন্ম- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)। সব ফেলে এখন এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে যে, কিভাবে এই আগ্রাসনের মোকাবেলা করা যায়।

এই সত্য জানতে ও বুঝতে হবে যে, এই আগ্রাসী শত্রুদের বিরুদ্ধে কারা আমাদের "ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স"। দিগন্তে কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে আর মাটিকে গ্রাস করে নিচ্ছে মুশরিকদের আগ্রাসনের ছায়া।

"যে শত্রু আপনাকে ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর তাকে থামাতে হবে, থামতে বাধ্য করতে হবে যে কোন উপায়ে।"

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নারীদের অবদান

খাদিজা আক্তার

ইসলামী আদর্শের ইনকিলাব প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনী আবেশ নতুন কিছু নয়। সেই মক্কার বালুকা রাশির উপর যে পদচিহ্ন এঁকে এই আদর্শের প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেই হুকুমাতে ইলাহিয়াত কায়েমের সংগ্রাম আজও অব্যাহত গতিতে চলছে, চলবেই ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী আন্দোলনের এই বীজ বপন এবং তা পূর্ণাঙ্গরুপে প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে সংঘাত সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়ে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে, ফাঁসির কাষ্ঠে প্রাণ দিয়ে, রাজপথ রঞ্জিত করে কালেমা তাইয়েবার প্রতিটি শব্দের মূল্য দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে এক লা শরীক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নিছক কোনো মুখের কথা নয়। চিরন্তন পথ পরিক্রমায় জুলুমবাজরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিটি আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করেছে শাহাদাতের এই আন্দোলনকে। অবশ্য এর জবাব দিতে একটুও ভুল করেনি এই আন্দোলনের অগ্রসেনানীরা।

সত্য প্রচারের অপরাধে সুষম সমাজের গোড়াপত্তন আর জালিমের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে পবিত্রতার পরশ দিয়ে সাজাতে চেয়েছে আল্লাহর এই জমিন। আদর্শহীন সেক্যুলার বাদীরা তাদের সমস্ত উপায় উপকরণ দিয়ে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে এই আন্দোলনকে। কিন্তু এই সত্যের সেনানীরা আদর্শের আগুন বুকে নিয়ে প্রতিবারই ময়দানে নিজেদের অবস্থানকে করেছে জোরালো থেকে আরো জোরালো। ওরা জানেনা, মুমিনরা যেখানেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, সেখানেই ভর করে আবার দাঁড়িয়ে যায় আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতায়।

শাশ্বত এই আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা করতে নারীর দায়িত্ববোধের জায়গাও কোনো যুগে কোনো অংশেই কম ছিলো না। বস্তুতঃ গোটা সমাজ ব্যবস্থা এখন ভেতর ও বাহির উভয় দিক থেকেই আক্রান্ত। আমরা আমাদের আদর্শকে সংকুচিত করতে করতে ব্যক্তি ও পরিবার পর্যন্ত নিয়ে আসলেও এখন আর তা এই দুইয়ের মাঝেও ধরে রাখা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় শুধু পুরুষের একার মাধ্যমে এই দ্বীনকে বিজয়ী করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সামগ্রিক ঐক্যবদ্ধ শক্তি। পবিত্র কুরআনে মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। তারা যাবতীয় ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক যাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী। " (আত-তাওবা:৭১)

ইতিহাসের ধারায় দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নারীর অবদান অনেক বেশি। যে অবস্থায় সমাজের একাংশ কালেমা তাইয়েবাকে বুলন্দ করতে যেয়ে আঘাতে আঘাতে রাজপথে লুটিয়ে পড়েছে, সেই অবস্থায় আরেক অংশ কখনোই নীরবে বসে থাকতে পারে না। আর ইসলাম ও তাকে ঘরে বসে শুধু তাসবীহ তাহলিলের অনুমতি দেয় না। বরং সমাজকে আদর্শের দিকে পরিচালিত করে সুসভ্য করতে তাকে আদেশ প্রদানও করে: "তোমরাই উত্তম জাতি। মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ হতে বিরত রাখবে।" (আলে-ইমরান:১১০)

এখানে মহান আল্লাহ্ নারীকে উত্তম জাতির অর্ধেক হিসেবে ঘোষণা করে তাকে এক চিরন্তন সামাজিক দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে ঘোষণা করেছে। পৃথিবীতে মহিলারা নিজেদের ধর্ম ও সভ্যতা সংস্কৃতির সবচাইতে বড় রক্ষক হয়ে থাকে। এই মায়েদের দ্বারাই সন্তানরা কালেমা শিখতো, কুরআন শিখতো, শিখতো ইসলামের রীতিনীতি। এর প্রভাব এতটা কার্যকর ছিলো যে, ইউরোপ আমেরিকার চরম বস্তুবাদী পরিবেশে থেকেও তাদের সেই চেতনা মুছে যেত না, যা তাদের মা প্রথমদিন থেকেই তাদের মন মগজে অঙ্কিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা এখন পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতায় নিজেদের সমর্পণ করে দিয়েছে।

এই অবস্থা থেকে নারী সমাজের নৈতিক পুনর্গঠনের জন্য যাবতীয় চেষ্টা সাধনা নারীদের মধ্য থেকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এটা পুরুষের মাধ্যমে করা কঠিন। কেন না সাম্য থেকে একটি বিকৃতি দূর করার জন্য আরেক বিকৃতির পথে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি ইসলাম প্রদান করে না। আর সবচেয়ে বড় সুবিধাজনক বিষয় হচ্ছে নারী সমাজের বিকৃতি হয় অজ্ঞতা, মূর্খতা, শিক্ষার কমতি এবং অন্যান্য কারণে। একটু মনোযোগ দিলে এই জায়গার পরিবর্তন আনা খুব বেশি কঠিন হবে না নিশ্চয়ই। তাছাড়া আমাদের তো গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আর বর্তমান অভিজ্ঞতা আছেই।

মুসলিম মহিলারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই দায়িত্ব উপলব্ধি করে ত্যাগ ও কুরবানীর অনেক নজির স্থাপন করে গেছেন। আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে হযরত খাদিজা (রাঃ) তার সম্পদের সবটুকুই দিয়ে দিলেন। আল্লাহর রাসূল (সা) যে সমাজে প্রথম দাওয়াতের কাজ শুরু করেন সেই সমাজে দাওয়াত গ্রহণ করার অর্থ কি ছিলো তা সবাই জানত। অবর্ণনীয় বিপদ মুসিবতের এই সময়ে প্রথম সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সাড়া দেন খাদিজা (রাঃ)। সাথে সাথে আল্লাহর রাসূলকে দেন অদৃশ্য সাহায্য লাভের আশ্বাস।

সুমাইয়া (রাঃ) এর উপর নির্যাতনের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লেও তিনি ছিলেন আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থাশীল। হযরত খানসা (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানে পুত্রদের ঠেলে দিয়েছিলেন শহীদ হওয়ার জন্য।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর এর কাহিনী আরো বিস্ময়কর। তিনি পুত্রকে বলেন, "তুমি জয়ী হয়ে ফিরে আসলে আনন্দিত হবো। কিন্তু তুমি আমার কোলে ফিরে না আসলেও আল্লাহর শোকর আদায় করবো।"

এভাবে শুধু নিজের জীবন দিয়ে নয়, প্রাণ প্রিয় কলিজার সন্তানকে গরম তেলের ডেকচিতে ভেজে ঈমানের সত্যতার প্রমাণ দিয়ে বাতিলের সামনে খাড়া মস্তিষ্কে বিবি আসিয়া। হযরত সাফিয়া (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানে প্রাণাধিক প্রিয় ভাইয়ের লাশ দেখে মরিয়া হওয়ার পরিবর্তে মন্তব্য করেছিলেন: "আল্লাহর রাস্তায় এটা কোন বড় কোরবানী নয়।"

এই জয় মুসলিম নারীর ইতিহাস। যারা প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পেয়েছেন তারা কখনোই একটা মুহূর্তের জন্য বাতিলের কাছে নিজেকে সপেঁ দিতে জানে না। তারা জানে বাতিলের মসনদকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য দৃঢ় ঈমানী শক্তি নিয়ে ত্যাগ ও কুরবানীর নজরানা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে প্রভুর সন্তুষ্টি কিভাবে অর্জন করতে হয়। আর এই সম্প্রদায় যতদিন পর্যন্ত না হযরত আসমা (রাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ না করবে, ততদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এর মত বীর সেনানী কিভাবে জন্ম নেবে?

ইসলামের জন্য শূলে আরোহণ রত ছেলেকে দেখেও যে মা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, বরং ছেলেকে অবিচল থাকতে বলেন।

ইসলামের সোনালী যুগের যুদ্ধ বিগ্রহে পুরুষেরা যেখানে তীর বর্শা নিক্ষেপ করে, তরবারি চালিয়ে যুদ্ধ করেছে, হতাহত হয়েছে, সেখানে নারীরা আহতদের পানি খাইয়েছে, ব্যান্ডেজ করেছে, এমনকি নিজের অর্থসম্পদ ও গহনাপাতি পর্যন্ত দিয়ে দ্বীনের সাহায্য করেছেন। যতই প্রিয় জিনিস হোক না কেন, এই পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালে তারা সেই বাধা কে ছুঁড়ে ফেলে দিতো। প্রিয়তম স্বামীও বেদ্বীন হলে সে আমলের মুসলিম নারীদের চোখ বিকৃত হতো। যদি স্বামী ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতো, তৎক্ষণাৎ সে স্বামীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতো।

আল্লাহর ভালোবাসা তাদের কাছে এতটাই প্রবল ছিল যে, তা পাহাড়সম শক্তি দিয়েও তাদের এই নরম হৃদয়ে এতটুকু আঁচও ফেলতে পারেনি।

যুদ্ধের ময়দানেও মহিলা সাহাবীদের ভূমিকা ছিল অনেক অবর্ণনীয়। উম্মে আম্মারা (রাঃ) এর শরীরে ওহুদ যুদ্ধের সময় কমপক্ষে ১২টি আঘাতের চিহ্ন ছিল। আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন শত্রুর তীর ও বর্শার আঘাত। ওহুদের ময়দানে মুসলিম সৈন্যরা ওলট পালট হয়ে গেলেও তিনি ছিলেন দৃঢ়পদ। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে দেখে বলেছিলেন, "হে বাইয়াত গ্রহণকারিনী! আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন।"

এভাবে অসংখ্য মহিলা সাহাবীর অসীম আত্মত্যাগ ও দৃঢ়তা দিয়ে এই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। মাওলানা মওদুদী (রঃ) বলেন, "যে খোদার দাসত্বের প্রতি ইসলামের আহ্বান জানায়, তিনি যেমন পুরুষের খোদা, তেমনি নারীরও খোদা।" এখানে পার্থক্য শুধু কর্মক্ষেত্র তাই এই দুই ধারাকেই এক হয়ে জীবন সংগ্রামে বিজয়ী হতে হবে।

মূলত ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের হলেও নানা ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যখন নিজেই নিজের স্বার্থ চর্চায় মৌলিক দায়িত্ব থেকে হাত গুটায় তখন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার মত একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে সমাজের অর্ধাঙ্গী হিসেবে গুরুত্ব সহকারে ভূমিকা রাখা কি অনস্বীকার্য নয়? যদি এমনও হয় যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার দিকটা তুলনামূলক অনেক বেশি মনে হয়। তাহলে যে অধিকার আদায়ের জন্য এত ক্যানভাসে ভেসে যাচ্ছে এই নারী জাতি, সেই অধিকার কি অনৈসলামীক সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকলে লাভ করা সম্ভব? সেখানে তাকে সমস্ত ভোগ্য পণ্যের মাধ্যম করা হয়। অনেকেই মনে করেন এত মহামারী যেখানে চলছে সেখানে আসলে কি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে? হ্যাঁ এটা ঠিক যে সমাজে জীবনের প্রতিটি ছিদ্র পথই অনৈসলামিক ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ, কিন্তু ভাববার বিষয় হচ্ছে কোন আক্রান্ত অংশে যদি ওষুধ সরবরাহ না করা হয়, তাহলে এটা খুব দ্রুত সংক্রামিত হওয়া কি স্বাভাবিক নয়?

আবার বাস্তবতাকেও উপেক্ষা করছি না যে, সমাজের এই অংশের চিকিৎসায় নেমে স্বাভাবিক পন্থায় সংস্কার হয়ে যাবে। বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এর বাস্তব নমুনা আমাদের কাছে আছে।

রাসূল (সাঃ) এর সময় শুধু অশ্লীলতা নয় বরং পশুবৃত্তিক পৈশাচিক অধঃপতিত সেই সমাজ থেকেও সর্বোচ্চ তাকওয়াবান মানুষ তৈরী হলো। তৈরি হলো পৃথিবীর উন্নত শ্রেষ্ঠ পরিচয়সম্পন্ন মানুষ। যাদের সততা, পবিত্রতা, বিশ্বস্ততার সমস্ত পৃথিবী তাদের কাছে মাথা নত করলো।

এখানে যদি কার্যকারণ কর্মতৎপরতার দিকে তাকাই তাহলে যে বিষয়টি একবাক্যে বলতে হয়, সেটি হলো উন্নত দক্ষ ও যোগ্য এক দল সংস্কারবাদীদের অকুতোভয়ী সম্মিলিত প্রয়াস। এরকম উভয়বাদী (নারী-পুরুষ) সংস্কারক না থাকলে সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করা কখনোই সম্ভব হতো না। তৈরি হতো না আসিয়া, সুমাইয়া আর বর্তমান জয়নাব আল গাজ্জালীর মত বিপ্লবী নারী।

সূরা নিসার ৭৭ নং আয়াতে এসেছে, "তোমরা কি তাদেরকেও দেখেছো যাদেরকে বলা হয়েছিলো তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখো এবং নামায কায়েম করো যাকাত দাও। এখন তাদেরকে যুদ্ধের (জিহাদের) হুকুম দেয়ায় তাদের একটি দলের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, তারা মানুষকে এমন ভয় করেছে যেমন আল্লাহকে ভয় করা উচিত অথবা তার চেয়েও বেশি।"

এ আয়াতের মাধ্যমেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খাঁটি ঈমানদার ও মুনাফিক শ্রেণীকে বাছাই করে নিলেন। তাই ঠান্ডা প্রকৃতির ইসলামী আন্দোলন নয় বরং উন্নত সংস্কারবাদী হিসেবে সমাজ পরিবর্তনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে আল্লাহর উলুহিয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে যেতে হবে। অতীতেও ঠিক এভাবেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর আজও এভাবেই এই দ্বীন বিজয়ী হবে ইনশাআল্লাহ।

ইনসাফ তালাবন্দি

সামশুন নেহার

অশ্রুসিক্ত আখি, হৃদয় হাহাকার!
ওহে পবিত্র বাবরি-
তোমার শাহাদাত, মুসলিম জাতির কাছে, লজ্জার।
জানো বাবরি, তোমার ন্যায় বিচারে-
একজন উমারের খুব দরকার ।

কেননা ভারতবর্ষের সংবিধান আজ শয়তানরূপী
মানবদরদীর আড্ডাখানা, বেইনসাফী ওদের কারবার।

৭০ বছর পূর্বের, ডক্টর- বি-আর- আম্বেদকরের
দেওয়া সংবিধান ভাঙতে...
অত্যাচারিত, হিংসাত্মক বি, জে, পি সরকারের,
হাত কাপলও না একটিবার।

ওহে বাবরি- জানো
তোমার ইনসাফ শুধু বি, জে, পির বেড়াজালে বন্দি,
তা কিন্তু নয়!
নামে মাত্র স্বাধীনতায় সকল নারী-পুরুষ
মুসলিম জাতিই বন্দি, পরাধীনতার খাঁচায়।

ঘৃণা করি ভারতবাসীর আজাদীর স্লোগানকে
ঘৃণা করি,ধর্ম-বর্ন নির্বিশেষে সকলে ভাই ভাই
এই বচনভঙ্গীকে।

ছি....
ভারতবর্ষ নাকি ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ, লজ্জার বিষয়...!
যেখানে শুধু ধর্মকে কেন্দ্র করে
মুসলিমদের উপর হামলা চালায়।

তবে ভেবে রাখিস
ওরে জালিম শাসক, সময় কিন্তু স্থির নয়,
মরন তোকেও ছুঁবে এ ভেবে আনন্দ পাই।
কারন তোর মৃত্যু কামনা,
আমার মতো সকল বাবরি প্রেমিকের শিরায় শিরায়।

ওগো আল্লাহ! তুমি তো অন্তর্যামী হৃদয়ের কান্না তো
তোমার কছে স্পষ্ট। পবিত্র বাবরি মাসজিদের শাহাদাত
একেকজন মুমিনের কাছে হৃদয়বিদারক- যন্ত্রনা অসহ্য।

হে আল্লাহ!
তুমিই মুমিনদের জন্য যথেষ্ট,
প্রত্যকটা বেদনাদায়ক নিঃশ্বাসের সাক্ষী থেকো ওগো আল্লাহ্
তুমি আমাদের ক্ষমা করো।।

ইনসাফ তালাবন্দি।
ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নাকি, মুসলিমরা জঙ্গি...
নাম তো ওদেরই দেওয়া, আছে আরও কত্ত কি...!

কিন্তু! দেখো... জঙ্গি কারা???

৫ই আগষ্ট প্রমান করে দিল ভারতের সংবিধান,
পচা নর্দমায়।
নইলে কি আর এভাবে কাপুরুষেরা-
অন্যের হক ছিনিয়ে নেয়।।

ইনশাআল্লাহ

ইব্রাহীম

জালিম ইহূদীরা যবর দখলে নিল ফিলিস্তিন,
অত্যাচার-অন্যায়-অবিচারে উচ্ছেদ চললো
প্রতিদিন।
শিশু-বৃদ্ধ,যুবক-যুবতী লাখো হলো উদ্বাস্তু,
হত্যা-গ্রেফতারির ভয়ে বাকিরা ভীত-সন্ত্রস্ত।

পবিত্র ভূমি আজ জালিমদের দখলে,
অশ্রু নিয়ে চোখে সে ডাকে তোমাকে।
ঘেঁটে দেখো পূর্বসূরিদের ইতিহাস পাতা,
স্মরণ করো রোম প্রাসাদে খালিদের সাহসিকতা।
জ্বলে ওঠো বুকে নিয়ে উম্মাহর ব্যাথা,
গুড়িয়ে দিতে জালিম-কাফিরদের সকল
দাম্ভিকতা।
ইনশাআল্লাহ..ইনশাআল্লাহ.. ইনশাআল্লাহ

নবীর মেরাজের ইতিহাস এ ভূমি,
উমরের বিজিত পবিত্র এই ভূমি।
সালাহউদ্দীন বাহীনির গৌরব এ ভূমি,
ইহূদী কবরস্থান হবে এই ভূমি।
ইনশাআল্লাহ.. ইনশাআল্লাহ.. ইনশাআল্লাহ

কারওয়ানে উকাব পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, মুর্শিদাবাদ

শিক্ষামূলক ভ্রমণ, দেবিদাসপুর সার্কেল

তারবিয়াতি প্রোগাম, মহেশাইল সার্কেল

সত্যবাক একটি গবেষণামূলক ও মননশীল ইসলামী ম্যাগাজিন।
এটি নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়ান।

এটির পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য ভিজিট করুন- **https://satyabaak.iyfindia.org**

অন্যান্য ভাষায় আমাদের মুখপত্রসমূহ

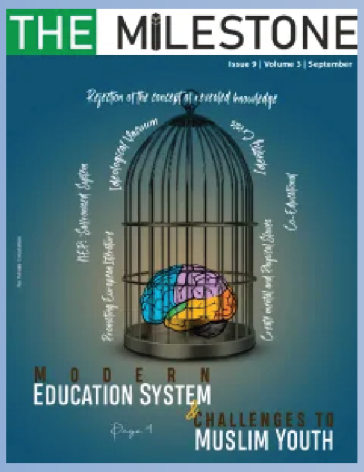

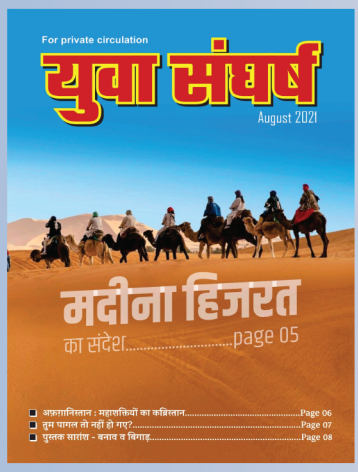

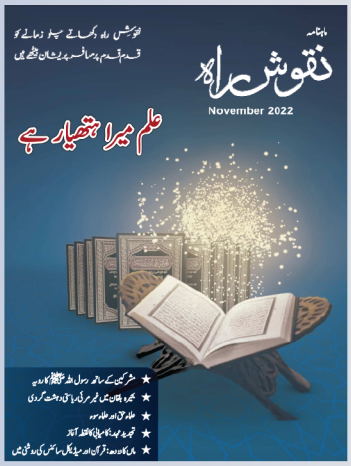

DOWNLOAD

ইংরেজি ‘দ্য মাইলস্টোন’ https://themilestone.iyfindia.org
হিন্দি ‘যুবা সংঘর্ষ’ http://yuvasangharsh.iyfindia.org
উর্দু ‘নুকুশ ই রাহ’ https://iyfindia.org/urdu-magazine

FRIENDS MODERN BAG MANUFACTURING CO.

F.M.B.M.Co

PHONE NUMBER

9635779370
9932389483
7679487038

Peninsula

এখানে বিভিন্ন ধরণের স্কুল ব্যাগ, অফিস ব্যাগ, হালখাতার ব্যাগ, জুয়েলারি ব্যাগ, ননওভেন ব্যাগ ইত্যাদি প্রিন্টিংসহ সুদক্ষ কারিগর দ্বারা তৈরী করা হয়।

বিঃদ্রঃ- এখানে বিভিন্ন ধরণের ব্যাগ অর্ডার অনুযায়ী তৈরী করা হয়।

Vill - Jadabnagar, Naskarpur, Samserganj, Murshidabad

পথ নির্দেশ - ঘোষপাড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে নস্করপুর বাহাগোলপুর ঘাট গামী রোড

Published by Md Jaidur Rahaman on Behalf of Islamic Youth Federation
State Office - 3B Crescent Apartment, 2nd Floor, Hatiara, Kol-157
Editor - Saud Hasan, Mobile - 8250712281
Email - satyabaakwb@gmail.com